وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তোমাদের চেয়ে উঁচু স্তরের লোকদের দিকে দৃষ্টি দিও না। কেননা আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬১৯)।

● ৭ম বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● আগস্ট ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٧، محرم و صفر ١٤٤٥هـ/ أغسطس ٢٠٢٣م العدد: ١٠، الجزء: ٨٢
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

বায়তুল মাকমুর গ্র্যান্ড মসজিদ, আচেহ, ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে অবস্থিত সুদৃশ্য মসজিদটি ১৯৯৯ সালে উদ্বোধন করা হয়। ৩৫০০ বর্গমিটার আয়তনের সুবিশাল মসজিদটিতে একসঙ্গে ৭০০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। এশীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত মসজিদটিতে দুটি সুউচ্চ মিনার ও ৫টি গম্বুজ রয়েছে। বিশেষভাবে তৈরি লাল ইট দ্বারা নির্মিত মসজিদটির ভেতরের অংশ সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফি দ্বারা সুসজ্জিত।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৫ || ঈসায়ী ২০২৩ || বঙ্গীয় ১৪৩০

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ আগস্ট	১৩ মুহাররম	মঙ্গলবার	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৫ ,,	১৭ ,,	শনিবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
১০ ,,	২২ ,,	বৃহস্পতিবার	০৪:১১	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৭:৫৭
১৫ ,,	২৭ ,,	মঙ্গলবার	০৪:১৪	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৩	০৭:৫২
২০ ,,	০৩ ছফর	রবিবার	০৪:১৭	০৫:৩৫	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৭
২৫ ,,	০৮ ,,	শুক্রবার	০৪:১৯	০৫:৩৭	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪২

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+২	+৫	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৪	+১
মাদারীপুর	+৩	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+২	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+২
শেরপুর	-১	০	+৩
জামালপুর	-১	০	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৩	-৮
কক্সবাজার	-১	-২	-১০
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৮
রাঙ্গামাটি	-৪	-৫	-৯
বান্দরবান	-৩	-৪	-১০
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	০	-১	-৪
লক্ষীপুর	+১	০	-৩
চাঁদপুর	+১	০	-২
ফেনী	-২	-২	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৭	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০
নাটোর	+৪	৫	+৭
পাবনা	+৪	+৫	+৭
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৪
বগুড়া	+২	+৩	+৬
নওগাঁ	+৪	+৫	+৮
জয়পুরহাট	+২	+৪	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৮
দিনাজপুর	+২	+৪	+১০
গাইবান্ধা	০	+১	+৬
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৬
লালমনিরহাট	-২	+১	+৭
নীলফামারী	+১	+৩	+১০
পঞ্চগড়	+১	+৪	+১১
ঠাকুরগাঁও	+২	+৪	+১১

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৬	+২
বাগেরহাট	+৬	+৫	+১
সাতক্ষীরা	+৮	+৮	+৪
যশোর	+৭	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৪	+৮	+৭
মাগুরা	+৫	+৫	+৩
নড়াইল	+৫	+৫	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+৩	-১
পটুয়াখালী	+৪	+৩	-২
পিরোজপুর	+৫	+৪	০
ঝালকাঠি	+৪	+৩	-১
ভোলা	+২	+১	-৩
বরগুনা	+৫	+৪	-১

৭ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা
আগস্ট ২০২৩
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০
মুহাররম-ছফর
১৪৪৫

সূচিপত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৪০৭-০২১৮২২
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে : বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২২৫/-	৪৫০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-১৫) ০৬
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» কিতাবুল ঈমান (মিন্নাতুল বারী-২৮তম পর্ব) ১০
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» সদুপদেশ হলো দ্বীনের আবশ্যক বিষয় ১৩
মূল : উস্তায ড. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আদ-দিমাইজী
অনুবাদ : আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

» যুবসমাজের অধঃপতনের কারণ ও উত্তরণের উপায় (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৬
-মাহবূবুর রহমান মাদানী

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার (পর্ব-৪) ১৯
মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

» রহস্যে ভরা কান ও আধুনিক বিজ্ঞান ২১
-মো. হারুনুর রশীদ

» কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা (পর্ব-২) ২৪
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» কিশোর গ্যাং : কারণ, ধরন ও প্রতিকার ২৭
-মো. হাসিম আলী

◈ আরাফার খুৎবা
» সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করা ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া ৩২
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» ভাইরাল রোগে আক্রান্ত হবেন না! ৩৫
-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান

◈ নারীদের পাতা
» নারীর ডিজিটাল পর্দা ও পুরুষের স্বীয় পর্দায় উদাসীনতা ৩৬
-সুরাইয়া বিনতে মামূনুর রশীদ

◈ জামি'আহ পাতা
» মৃত্যুর স্মরণ! ৩৯
-আদিল আলাবি

◈ কবিতা ৪১

◈ সংবাদ ৪২

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

সিন্ডিকেটচক্রের বিষদাঁত ভেঙে ফেলুন

সুবহানাল্লাহ! কাঁচা মরিচের এত ঝাঁঝ! প্রচণ্ড ঝালে চোখের পানিতে ভেসেছে গোটা দেশ। অবিশ্বাস্যভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কেজি প্রতি ১২শ' টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে কাঁচা মরিচের দাম! ভাবা যায়! এ যেন রূপকথার গল্প!

এটি তো একটি উদাহরণমাত্র। এর আগে আমরা পেঁয়াজের ঝাঁঝেও চোখের পানিতে ভেসেছি। এভাবে দাম বাড়ে কখনও তেলের, কখনও চিনির, কখনও আলু, পটল, মাছ-মাংস ইত্যাদির। এমনি করে মধ্যস্বত্বভোগীদের সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য চলছে সর্বত্রই। সবকিছু চলে যাচ্ছে সিন্ডেকেটের কবজায়। সিন্ডিকেটচক্রের দৌরাত্ম্য কেবল নিত্যপণ্যেই নয়, বরং পরিবহন, ব্যাংক-বীমা, গ্যাস-বিদ্যুৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি, ঠিকাদারিসহ প্রায় সব সেক্টরেই বিস্তৃত। এমনকি জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসাসেবাও তাদের নিয়ন্ত্রণে। মধ্যস্বত্বভোগী এই চক্রটি যখন-তখন, যেভাবে খুশি পণ্যের দাম বৃদ্ধি করছে এবং ভোক্তাকে জিম্মি করে বেআইনিভাবে নিজেদের পকেট ভারী করছে। ফলে উৎপাদনকারীগণ ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না, বরং অনেক সময় তাদেরকে লোকসানে পণ্য বিক্রি করতে হচ্ছে। এদিকে ভোক্তাগণ চড়া মূল্যে পণ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। সিন্ডিকেট শব্দটি সবসময় নেতিবাচক না হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে শব্দটি এখন দেশের সাধারণ জনগণের কাছে নেতিবাচক ও আতঙ্কের শব্দে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের ঠকানোর যাবতীয় আয়োজন করা হয়।

সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত দেশের রাঘববোয়ালেরা। ব্যবসায়ীদের উঁচু পর্যায়ের সিন্ডিকেটবাজদের অর্থ ও ক্ষমতার জোর এতই বেশি যে, তাদের কাছে সরকারকেও জিম্মি থাকতে হয়। এর একটি মূল কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো ব্যবসায়ীদের টাকা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতায় চলে। আর ব্যবসায়ীরা এখন সরাসরি রাজনীতির মাঠে নেমে পড়েছেন। স্বাধীনতার পর জাতীয় সংসদে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সাড়ে ১৭ ভাগ ছিলেন ব্যবসায়ী। ১৯৯১ সালে যা বেড়ে ৩৮ ভাগে দাঁড়ায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একাদশ জাতীয় নির্বাচনে শপথ নেওয়া সংসদ সদস্যদের ১৮২ জনই পেশায় ব্যবসায়ী, যা মোট সংসদ সদস্যের ৬২ ভাগ। বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্বে আছেন ব্যবসায়ীরা। তারাই আইন প্রণয়ন করছেন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করছেন, সরকার চালাচ্ছেন। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের কাছে ব্যবসা আর মুনাফাই প্রাধান্য পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অর্থ ও ক্ষমতার জোরে এসব রাঘববোয়ালেরা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান।

যে কোনো অবৈধ উপায়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না' *(আন-নিসা, ৪/২৯)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের মাল হাতিয়ে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার উপর ক্রোধান্বিত অবস্থায় সে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে' *(আহমাদ, হা/৩৯৪৬)*। হারাম খেলে বা পরলে ব্যক্তির ইবাদত কবুল হয় না *(মুসলিম, হা/১০১৫)*। মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মওজুদদারি করতে পারে না' *(মুসলিম, হা/১৬০৫)*। যে কোনো ধরনের যুলম ক্বিয়ামতের ময়দানে অন্ধকারের কারণ হবে *(বুখারী, হা/২৪৪৭)*। বরং অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের হিসাব না দেওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামতের দিন ব্যক্তির পাদ্বয় আল্লাহর সামনে থেকে এক ধাপও সরতে পারবে না *(তিরমিযী, হা/২৪১৬)*।

আমরা মনে করি, দ্বীনদার, আমানতদার, পরহেযগার ও পরকালমুখী ব্যক্তি ছাড়া এসব দুর্নীতি কখনই বন্ধ করা যাবে না। সেজন্য এসব বৈশিষ্ট্যের মানুষ তৈরিতে কাজ করতে হবে। ধর্মমুখী সিলেবাস প্রণয়ন করে শেকড় থেকে সেই শিক্ষা দিতে হবে। দুর্নীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সাবধান করতে হবে। বাজার ব্যবস্থাপনা সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে এবং নিয়মিত বাজার মনিটরিং করতে হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কড়া নজরদারি থাকতে হবে। খুচরা ও পাইকারি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শুধু নয়; বরং বড় আমদানিকারক, শিল্প গ্রুপ, নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রকশ্রেণির বিরুদ্ধে আগে অভিযান চালাতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেলের অধীনস্থ টিমগুলোকে বাজার তদারকিতে মাঠে থাকতে হবে। দেশে সিন্ডিকেট ও মওজুদের বিরুদ্ধে যে আইন আছে, কঠোরভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিসহ সার্বিক সমৃদ্ধি দান করুন। আমীন!

আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

সরল অনুবাদ : আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) প্রত্যাশা করবে, তোমার মধ্যে যে গুনাহই থাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আর আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের সমপরিমাণ হয় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করে (আখেরাতে) সাক্ষাৎ কর, তাহলে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব’।[১]

হাদীছটির মর্যাদাগত অবস্থান : ইবনু দাক্বীক্ব আল-ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছটি মানবতার মুক্তির এক মহান সুসংবাদ। অপূর্ব সহনশীলতা ও মহান উদারতার এটি এক অন্যন্য নিদর্শন। অগণিত পুণ্য, অসীম দানশীলতা, গভীর সহানুভূতি, পরম করুণা ও একনিষ্ঠ কৃতজ্ঞতার জ্বলন্ত প্রমাণ এটি।[২] আল-জারদানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীছের ভাণ্ডারে যত হাদীছ আছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক। এটি আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা এবং তাঁর অসীম উদারতা ও প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ইঙ্গিত। তবে এতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে পাপে জড়ানো উচিত নয়। কেননা হাদীছের উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার ক্ষমার ব্যাপকতা ও দয়ার মহত্ত্ব বর্ণনা করা, যাতে অধিক পাপে জড়িত কেউ নিরাশ না হয়।[৩]

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীছ। কারণ এতে তাওহীদের মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের প্রথম ও প্রধান বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। এই হাদীছে আল্লাহ তাআলা যে সর্বোত্তম প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন তার কারণও হলো তাওহীদ। আর তাওহীদের পুরস্কার এমনই হয়ে থাকে।[৪]

হাদীছের শিক্ষা :

(১) তওবা করা আর তওবার জন্য উৎসাহ দানে এটি একটি মৌলিক হাদীছ।

(২) গুনাহ বড় হলেও আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন।

(৩) ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিকট দু‘আ করা এবং এজন্য আশাবাদী হওয়া।

(৪) তাওহীদে বিশ্বাস পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। যেমন— আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। তবে অন্য যে কোনো পাপ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি ক্ষমা করেন’ *(আন-নিসা, ৪/১১৬)*।

(৫) আল্লাহর রহমতের মহত্ত্ব ও দয়ার প্রাচুর্যের তুলনায় মানুষের দুর্বলতা ও পাপকে ক্ষুদ্র মনে করা।

ব্যাখ্যা : হাদীছটি আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত করে, আত্মাকে সুদৃঢ় করে আর অশ্রুকে প্রবাহিত করে। আমাদের বিবেককে অনুশোচিত করে আর মনকে আশাবাদী করে। আমাদের হতাশা ও ব্যর্থতার কারণ দূর করে দেয়। এটি এমন একটি ইলাহী আহ্বান, যা কারো কানে প্রতিধ্বনিত হলে সে প্রচণ্ড আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে আল্লাহর নিকে ছুটে যায়। এটি এমন একটি অমিয় আহ্বান, যার উচ্চারণে এর অনুস্মারকের প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়। এটি এমন একটি অসাধারণ বাণী, যা পাঠকের আত্মাকে প্রশান্তি দেয়। কতইনা

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. তিরমিযী, হা/৩৫৪০, হাদীছ ছহীহ।

২. ইবনে দাক্বীক্বুল ঈদ, শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ১৩১; ইবনু আত্তার, শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ১৯২; গৃহীত: alukah.net.

৩. আল-জাওয়াহিরুল লূলূইয়্যাহ, শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ৩৭৭; গৃহীত: alukah.net.

৪. ক্বাওয়ায়েদ ওয়া ফাওয়ায়েদ মিনাল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ৩৫৭; গৃহীত: alukah.net.

উত্তম উপদেশ এটি! কতইনা অবিস্মরণীয় মধুর ডাক এটি!!

হাদীছটিতে মুমিন বান্দার জন্য বড় সুসংবাদ এসেছে। কারণ আল্লাহর রহমতের বিশালত্ব এবং তাঁর অনুগ্রহের মহত্ত্ব কোনো সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর দয়ার ব্যাপকতা ও ভালোবাসার গভীরতা কোনো পরিমাপ যন্ত্রে মাপযোগ্য নয়।

সুধী পাঠক! হাদীছটি পাপ বর্জনের পথ অন্বেষকের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। পাপ থেকে মুক্তিকামী মুমিনের জন্য আলোকবর্তিকা। হে পাঠক! হাদীছটির মর্যাদাগত রহস্য উপলব্ধি করতে হাদীছটির মর্মার্থ অনুধাবনই যথেষ্ট। কারণ হাদীছটির বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যান্য হাদীছ থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, হাদীছের ভাণ্ডারে যত হাদীছ আছে, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক।

যেসব কারণে আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফ করে দেন, সেগুলো ব্যাখ্যা করলে হাদীছটির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। প্রার্থনা সেই কারণগুলোর অগ্রভাগে আসে। প্রার্থনা আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক মহান মাধ্যম। এটি বান্দা ও স্রষ্টার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র সৃষ্টি করে। এটি একজন মুমিনের অস্ত্র, যা তিনি প্রতিকূলতা ও দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় দু'আ করার জন্য আমাদেরকে তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾ 'আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতে অহংকার করবে, তারা অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(গাফের, ৪০/৬০)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ﴾ 'আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (তখন আপনি বলুন) আমি নিকটেই আছি, আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার কথায় সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি বিশ্বাস করে, যাতে তারা হেদায়াত পায়' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*। আর নবী করীম ﷺ আল্লাহকে ডাকতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, তার উপর তিনি রাগান্বিত হন'।[৫]

যাহোক, ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। যাতে প্রার্থনাটি উত্তর পাওয়ার যোগ্য হয় এবং গৃহীত হওয়ার জন্য অধিক সম্ভাবনাময় হয়। যেমন— আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রাখা এবং ক্ষমা পাওয়ার স্বপ্ন ও আশা জীবন্ত রাখা। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন, 'এমনভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে, যাতে উক্ত ডাকের সাড়া পাওয়া নিশ্চিত হয়। জেনে রাখো! গাফেল ও অসতর্ক হৃদয়ের ডাকে আল্লাহ তাআলা সাড়া দেন না'।[৬] আল্লাহকে ডাকার উপযুক্ত সুফল পাওয়ার জন্য অবশ্যই সৎ আমলের ভিত্তি দৃঢ় হতে হবে। শুধু ভাসমান ইচ্ছা কিংবা কাল্পনিক স্বপ্ন হলে হবে না।

তাছাড়াও একজন মুসলিমকে প্রার্থনায় অবশ্যই সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। তাকে আবেদনে হতে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন না বলে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন; বরং সে যেন আল্লাহর নিকট দৃঢ়তার সাথে চায়। কারণ তাঁর নিকট বাধ্যবাধকতার কোনো কিছু নেই'।[৭] দৃঢ়তার সাথে চাইলে তিনি অসন্তুষ্ট হন না।

এখন ক্ষমার আলোচনায় আসা যাক। ক্ষমার আবেদন হলো পাপকে গোপন রাখা এবং উপেক্ষা করা। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রশংসা করে বলেছেন, ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ﴾ 'আর যারা ভোরবেলা ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(আলে ইমরান, ৩/১৭)*। এই আয়াতে পাপে জড়িত হওয়ার পর ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا﴾ 'আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বা নিজের উপর যুলুম করে, তারপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পাবে' *(আন-নিসা, ৪/১১০)*।

---

৫. তিরমিযী, হা/৩৩৭৩, হাদীছ ছহীহ।
৬. তিরমিযী, হা/৩৪৭৯, হাসান; সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৯৪।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৩৮; তিরমিযী, হা/৩৪৯৭।

তারপরও, ক্ষমা চাওয়া অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় বেশি শ্রেষ্ঠ। কারণ এর বরকত কেবল গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া ও পাপ মোচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর কল্যাণ আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার ফলে পৃথিবীতে শস্য ও ফসল উৎপন্ন হয়। দু'আর মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার লাভ করে এবং যেকোনো কাজের প্রস্তুতি শক্তিশালী হয়। যেমন— আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ 'অতপর আমি বললাম, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, কারণ তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তিনি তোমাদের জন্য উদ্যান এবং নদী তৈরি করবে' *(আন-নূহ, ৭১/১০-১২)*।

এই কারণে অনেক আয়াতে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। অনেক নবী ও রাসূলের বারবার ক্ষমা চাওয়াটাও অবাক হওয়ার কোনো বিষয় নয়; বরং আমাদের নবী ﷺ এক বৈঠকে ১০০ বারেরও বেশি ক্ষমা চাইতেন। যেমন— আগার আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ 'আমি একদিনে আল্লাহর নিকট ১০০ বার ক্ষমা চাই'।[৮]

ক্ষমা প্রার্থনা ততক্ষণ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ না তা এমন একজন মুমিনের অন্তর থেকে সংঘটিত হয় যার হৃদয় প্রভুর মহিমায় উদ্দীপ্ত থাকে, অবহেলা ও ত্রুটির জন্য যার মন অনুতপ্ত হয়, যার অত্মা অনুশোচনা ও আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। অন্যথা তা একটি সারশূন্য অনুতাপ হিসেবে গণ্য হবে যার কোনো উপকারিতা নেই।

অতঃপর ক্ষমা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মাধ্যম হলো তাওহীদের দাবি পূরণ করা। আর তা হলো তাওহীদের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। তাওহীদের শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করলেই কেবল তাওহীদের প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে এ সম্পর্কে বলেছেন, ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ﴾ 'যারা ঈমান আনে এবং তাদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশায় না; তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে' *(আল-আনআম, ৬/৮২)*। এখানে তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন, যাদের ঈমান শিরকের জঞ্জাল থেকে পবিত্র ছিল। তাদেরকে তিনি জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দানের সুসংবাদ দিয়েছেন। এত বড় ক্ষমায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ সমস্ত পাপ তাওহীদের মাহাত্ম্যের সামনে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না। যেমনটি মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا 'আল্লাহর উপর বান্দাদের অধিকার হলো যে, যারা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না'।[৯]

নিষ্পাপ জীবনযাপন কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। ভুল করা বা পাপে জড়িয়ে যাওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। শয়তান যেমন মানুষকে পাপে জড়াতে উৎসাহিত করে, তেমনি মানুষের মনও তাকে নানাভাবে পাপ সংঘটিত করতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু অনুশোচিত বা অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় গুণ। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখা এবং কোনো অবস্থাতেই শিরকে না জড়ানো তার সবচেয়ে বড় সংগ্রাম। তাই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে তিনি যেন আমাদের এই সংগ্রামে সফল করেন। তিনি যেন আমাদেরকে প্রকৃত তওবা করার তাওফীক্ব দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে আশাবাদী করেন ও শুভ ফলাফলের জন্য ধৈর্য দান করেন। তিনি যেন আমাদের ত্রুটিগুলো দূর করেন। তিনি আমাদের পদস্খলনগুলো ক্ষমা করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার ও তাঁর নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০২।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৫৬।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-১৫)

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : মুক্তির পথ

ইমাম আবূ নু'আইম ইস্পাহানী তার 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' কিতাবে (২/২১৮) সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আছেম আল-আহওয়ালকে আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ؛ فَإِنَّهَا تُوقِعُ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا '...তোমরা পক্ষপাতিত্ব করা থেকে সাবধান থাকবে। কেননা পক্ষপাতিত্ব তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। তোমরা প্রথম অবস্থা আঁকড়ে ধরে থাকো, যে অবস্থার উপর তারা ছিলেন **বিভক্তির আগে...'**।

আছেম বলেন, আমি ব্যাপারটা নিয়ে হাসান বাছরীর সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে চমৎকার নছীহত করেছেন এবং সত্য বলেছেন'। *বিবরণটির সনদ ছহীহ।*[১]

আপনি একটি ঘটনা নিয়ে একটু চিন্তা করুন, যেটি আবু নু'আইম তার 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' কিতাবে (২/২০৪) মুতার্রিফ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনিশ শিখখীর সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন; আবু নু'আইম-এর সূত্রে যাহাবী তার 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' গ্রন্থে (৪/১৯২) বর্ণনা করেন, মুতার্রিফ বলেন, 'আমরা যায়েদ ইবনে ছূহানের কাছে যেতাম। তিনি বলতেন, 'আল্লাহর বান্দারা! সম্মান করো এবং (আমল) চমৎকারভাবে সম্পন্ন করো। (মনে রেখো!) বান্দা কর্তৃক আল্লাহর নৈকট্য লাভ কেবল দু'টি উপায়ে সম্ভব: ভয় ও আশা। একদা আমি তার কাছে আসলাম, তখন দেখি **তারা একটি পত্র লিখেছেন, যেখানে তারা এধরনের কিছু বাক্য সাজিয়েছেন:**

إِنَّ اللهَ رَبُّنَا.....وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا
وَالْقُرْآنُ إِمَامُنَا.....وَمَنْ كَانَ مَعَنَا

বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব। আমরা একসাথে কাজ করব, আমরা একসাথে কাজ করব'।

তিনি পত্রখানা তাদের কাছে একজন একজন করে পেশ করতে লাগলেন আর তারা বলতে লাগলেন, 'হে অমুক! আপনি কি এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছেন?' এভাবে তারা আমার পর্যন্ত পৌঁছে আমাকেও বলল, 'হে অমুক! আপনি কি এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছেন?'

আমি বললাম, **না।**

যায়েদ ইবনে ছূহান বললেন, এই ছেলের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না।

বৎস! তুমি কী বলতে চাও?

আমি বললাম, إِنَّ اللهَ قَدْ أَخَذَ عَلَيَّ عَهْدًا فِي كِتَابِهِ فَلَنْ أُحْدِثَ عَهْدًا سِوَى الْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ **'মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থে আমার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। অতএব, সেই অঙ্গীকার ছাড়া ভিন্ন কোনো অঙ্গীকারের জন্ম দেওয়া আমার পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব নয়'।**

এরপর লোকেরা সবাই তাদের উপর্যুক্ত অঙ্গীকার থেকে ফিরে আসলো, তাদের কেউ আর স্বীকৃতি দিল না। তারা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় ৩০ জন।

এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা। 'জামা'আতবদ্ধ কাজ' বলতে সালাফে ছালেহীন কী বুঝতেন, ঘটনাটি সেকথা স্পষ্ট করে। তাদের বুঝ অনুযায়ী, 'জামা'আতবদ্ধ কাজ' কোনোভাবেই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর হাদীছের বাইরে যেতে পারে না।

এই ঘটনাটিতে অনেকগুলো উপকারী দিক রয়েছে:

(১) নিয়মিত আলেম-উলামার[২] নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের কথা শোনা ও উপকৃত হওয়া।

(২) **শরী'আতসমর্থিত কল্যাণ** গ্রহণে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ চলবে না।

(৩) আমাদের শরী'আতে যার বর্ণনা আসেনি, তার সবটাই প্রত্যাখ্যাত— যদিও মানুষ তাকে ভালো মনে করে। ইবনু

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. দ্রষ্টব্য: আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস মিন তালবীসি ইবলীস, পৃ. ৩৩।

২. যায়েদও আলেম-উলামার মধ্যে গণ্য। দ্রষ্টব্য: ত্বাবাক্বাত ইবনে সা'দ, ৬/১২৩-১২৬; তারীখু বাগদাদ, ৮/৪৩৯।

উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) যথার্থই বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً ‘প্রত্যেকটি বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা, **যদিও মানুষ তাকে ভালো চোখে দেখে**’।[৩]

অতএব, ভুলকে রংচং মিশিয়ে সুন্দর করে সাজালেই তা সঠিক হয়ে যাবে না।[৪]

(৪) শারঈ আমল ও দ্বীনী কথাবার্তা অবশ্যই শরী‘আতের ছাঁচে ফেলতে হবে; নবাবিষ্কৃত কোনো বিষয় বা দলীলবিহীন কোনো কিছুতে ফেলে সেগুলো মাপা যাবে না।

(৫) ব্যক্তি ছোট হোক বা বড় হোক হক্ব যার কাছ থেকেই আসুক না কেন, তা শুনতে হবে— যদি তার সাথে দলীল থাকে।

(৬) কুরআনে আল্লাহ কর্তৃক গ্রহীত অঙ্গীকারই উম্মতের জন্য পুরোপুরি যথেষ্ট। এই অঙ্গীকারের সাথে বহিরাগত অন্য কোনো অঙ্গীকারের দরকার নেই।

(৭) নাম আর বাহ্যিক রূপ বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে, বাস্তব রূপ। অতএব, শরী‘আতবিরোধী সবই প্রত্যাখ্যাত— তার নাম যাই হোক না কেন এবং ডিজাইন যতই চাকচিক্য হোক না কেন।

(৮) হক্বের দিকে ফিরে আসার মর্যাদা।

(৯) বেশি বা কম— ভুল ও সঠিক চেনার অথবা হক্ব ও বাতিল চেনার মানদণ্ড নয়।

(১০) দলীল জানা জরুরী।

(১১) পরামর্শ গ্রহণ ও অন্যের মতামত জানার গুরুত্ব।

(১২) বৈধ পদ্ধতিতে ও স্বাভাবিক রূপে ‘দলবদ্ধ কাজ’ অনেক ফলপ্রসূ— যদিও বাস্তবে তা খুব কম পাওয়া যায়।

এই বরকতময় দল, যারা হক্ব শুনে সেখানে আশ্রয় নেয়, তাদের এই সাহসী ভূমিকার ব্যাপারে আমি বলতে চাই, তাদের (সালাফে ছালেহীনের) পক্ষ থেকে **ইজমা বা প্রায় ইজমা** হয়ে গেছে যে, যেখান থেকে কোনোভাবে উম্মতের মধ্যে বিভক্তি ও ফাটলের দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে, তা নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই বিষয়টি মুখস্থ রাখুন এবং সবসময় স্মরণে রাখুন; মতভেদের সময় তা আপনাকে উপকৃত করবে।

এ বিষয়টি জানার পর আমাদের কাছে **‘মুক্তির পথ’**[৫] স্পষ্ট হয়ে গেছে। মুক্তির পথ নির্ভর করে মহান আল্লাহর এই বাণীর উপর: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ‘আর তোমরা পুণ্য ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো না’ *(আল-মায়েদাহ, ৫/২)*। যেমনটা বুঝেছেন এবং প্রয়োগ করেছেন সালাফে ছালেহীন।

অতএব, আমল, দাওয়াত ও মিলবন্ধনের মূল জায়গাটা হচ্ছে, ‘তাওহীদ ও মানহাজ। কেবল এই দু’টোর জন্যই শত্রুতা হতে পারে। আর তাওহীদের একটি আবশ্যিক বিষয় হচ্ছে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করা এবং অনুসরণ করা তার ছাহাবায়ে কেরামের। ফলে কোনোরূপ দলাদলির জন্য শত্রুতা চলবে না এবং কোনো প্রকার জামা‘আতের জন্য বিভেদ চলবে না’।[৬]

‘দলবদ্ধ কাজে’র পক্ষে উপর্যুক্ত আয়াত দিয়ে নবাবিষ্কৃত ও বিদ‘আতী নিয়মে দলীল উপস্থাপন শরী‘আত উপলব্ধির উল্টো। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ‘আর তোমরা পুণ্য ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো...’ *(আল-মায়েদাহ, ৫/২)*। তিনি কিন্তু এটাও বলেছেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ‘আর তোমরা সকলে একসঙ্গে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো...’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*।

---

৩. লালকাঈ, শারহু উছূলি ই‘তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ, আছার নম্বর: ১২৬, সনদ ছহীহ।

৪. সেজন্যই মুতার্রিফ সাজানো সেই কথাগুলোর বাহ্যিক রূপ নিয়ে ভাবেননি। কারণ ঐ কথাগুলোতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেই কাঠামোকে ঘিরে, যেখানে কথাগুলো রাখা হয়েছিল।

৫. এখানে আমরা ‘বিকল্প’ (اَلْبَدِيْلُ) কথাটি বলব না, যেমনভাবে আমরা ‘আধুনিক চিন্তাবিদদের’ কাছ থেকে সর্বদা শুনে থাকি। যারা দ্বীনের ভেতর অনেক কিছুই নতুনভাবে সৃষ্টি করেছে সেগুলোকে ‘বিকল্প’ কল্পনা করে। সেজন্য তাদেরকে বলতে দেখি, ‘ইসলামী ব্যাংক’, ‘ইসলামী সংগীত’, ‘ইসলামী নাটক’ ইত্যাদি।

আমরা আর কতকাল অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের গুহায় পড়ে থাকব?! আমাদের আশপাশে দেখব এবং অন্যদের অনুকরণ করব; যখন কোনো কিছুকে দ্বীনবিরোধী দেখব, তখন দ্রুত তার ‘বিকল্প’ বের করার চেষ্টা করব! সেটা করতে গিয়ে আমরা ব্যবহার করব নানা ‘ছলচাতুরী’, গলে মিশে যাব সবার সাথে, ‘ছাড় ও পদস্খলন’ খুঁজে বেড়াব এবং ‘ইসলামের আধুনিকীকরণ’ নিয়ে ব্যস্ত থাকব!

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নয় যে, এমনটি করা ইসলামী ব্যক্তিত্বের মূলনীতিবিরোধী, যে মূলনীতি স্বতন্ত্র, স্পষ্ট ও প্রকাশিত। আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের দ্বীন আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা এবং দাওয়াত দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতিপরিপন্থী বিষয়গুলো সে ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। অতএব, বুঝার চেষ্টা করুন।

সেকারণে ‘বিকল্প’ পরিভাষাটিকে ‘নিষিদ্ধ শব্দাবলি’র তালিকায় রেখে দিতে হবে।

৬. আদনান আর‘উর, আস-সাবীল ইলা মানহাজি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ, পৃ. ১৪৬।

অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ‘তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো না’ *(আল-মায়েদাহ, ৫/২)*। তিনি কিন্তু এটাও বলেছেন, ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ‘আর তোমরা বিভক্ত হয়ো না’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*।

ফলে **‘পরস্পর সহযোগিতা’**র আদেশটির বাস্তবায়ন শরী‘আতসম্মত পদ্ধতিতেই করতে হবে, যেন কোনোভাবেই **‘একতাবদ্ধ’** থাকার আদেশটি বাতিল না হয়ে যায়। অতএব, সাবধান! পদস্খলন ও ভ্রমে পতিতদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

বুঝা গেল, এই আয়াতে কারীমাটিই হচ্ছে মূল; এখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে। কারণ ‘আয়াতটিতে মানুষের পরস্পরের মধ্যকার এবং মানুষ ও তাদের রবের মধ্যকার **ইহকালীন ও পরকালীন** যাবতীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কোনো বান্দাই এই দু’টি অবস্থা ও কর্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়: একটি কর্তব্য তার ও আল্লাহর মাঝে এবং অপরটি তার ও সৃষ্টির মাঝে।

মানুষ ও সৃষ্টির মধ্যকার কর্তব্যের মাঝে রয়েছে— পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখা, সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং সঙ্গ দেওয়া। এসব ক্ষেত্রে তার করণীয় হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির ব্যাপারে পারস্পরির সহযোগিতাস্বরূপ মানুষের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে এবং তাদের সঙ্গ দিয়ে কাজ করে যাওয়া। এভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই বান্দার সুখ ও সাফল্যের গোড়ার কথা। এটা ছাড়া তার সুখ বলে কিছু নেই। আর সেটাই হচ্ছে পুণ্য ও তাক্বওয়া, **যে দু’টি হচ্ছে পুরো দ্বীনের নির্যাস।**[৭]

এ দু’টির কারণেই তার সম্পর্কহীনতা, এর কারণেই মিলবন্ধন, এর কারণেই ভালোবাসা, এর কারণেই শত্রুতা। সে তার যাবতীয় সম্পর্ক তৈরি করবে মহান আল্লাহর এ বাণীর উপর ভিত্তি করে: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ‘আর তারা পরস্পর পরস্পরকে হক্কের উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় ধৈর্যের *(আল-আছর, ১০৩/৩)*।

বান্দা তার ভাইদের সাথে একতাবদ্ধ থাকার সময় তাদের সাথে তার সব সম্পর্ক কেবল ‘মুক্তির উপায় এবং হক্ক ও ধৈর্যের উপদেশের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর এটা একটা বিরাট সম্পদ’।[৮]

‘সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পরস্পরের উপদেশ প্রদানের দাবি হচ্ছে, কল্যাণের দিকে আহ্বান করা এবং এ ব্যাপারে সাহায্য করা। এর আরো দাবি হচ্ছে, অনিষ্ট থেকে সতর্ক করা এবং খারাপদের সাথে সহযোগিতা বজায় না রাখা’।[৯]

সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পরস্পরকে উপদেশ প্রদানের আরো দাবি হচ্ছে— পরস্পর অধ্যবসায় করা, শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা নেওয়া, দাওয়াত দেওয়া, স্মরণ করিয়ে দেওয়া, পথ দেখানো, ভালো কাজের আদেশ করা, মন্দ কাজে নিষেধ করা, যৌথ দায়ভার গ্রহণ করা, ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি। আসলে এজাতীয় দাবি গণনা করে শেষ করা যাবে না। ইসলাম এগুলো বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে। এগুলোই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের বীজস্বরূপ হওয়া উচিত, দাঈগণ যার প্রচেষ্টা চালাবেন এবং এর জন্য সঙ্গবদ্ধ হবেন। ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ‘নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে’ *(আর-রা‘দ, ১৩/১১)*।

বিভিন্ন দল, জামা‘আত, সংগঠন যদি কিছু করে, তাহলে এগুলোর চেয়ে কী বেশি করবে?!

যিনি মুহাম্মাদ ﷺ কে হক্কসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলি, যে দাবিগুলোর কথা বলেছি, তারা সেসবের চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না। আর সেগুলো করলেও তারা করবে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং নির্দিষ্ট একটি বলয় থেকে।

এগুলো করার পেছনে তাদের মূল উদ্দীপক হচ্ছে, দলীয় ফরমান এবং সাংগঠনিক আনুগত্য।

এমনটা শোভনীয় নয় এবং জায়েযও নয়। কারণ ‘প্রত্যেকটা আমলের উৎস ও লক্ষ্য থাকা একান্ত জরুরী। সেজন্য কোনো আমলই আনুগত্য ও নৈকট্যের উপাদান হতে পারে না, যতক্ষণ না তা ঈমানী উৎস থেকে সঞ্চারিত হবে। **ফলে আমলের উদ্দীপক হতে হবে খাঁটি ঈমান;** না কোনো প্রথা-প্রচলন, না মনের খায়েশ, না প্রশংসা-প্রতিপত্তির অভিলাষ। বরং অবশ্যই তার উৎস হতে হবে **খাঁটি ঈমান।** আর লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেকী ও তাঁর সন্তুষ্টি’।[১০]

খাঁটি ঈমান এমন ঈমান, যেখানে কোনো ধরনের ভেজাল ঢোকেনি।

---

৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রিসালাহ আত-তাবূকিয়্যাহ, পৃ. ১০।

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৫০।

৯. মাজাল্লাতুল ফুরক্বান, ১৪ সংখ্যা, পৃ. ১০, প্রবন্ধ: পুণ্য ও তাক্বওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য, প্রণয়ন: আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বায।

১০. আর-রিসালাহ আত-তাবূকিয়্যাহ, পৃ. ১২।

আপনাকে আমার রব কল্যাণের তাওফীক্ব দান করুন। যেসব দলবাজ দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং এর কারণে তাদের কর্মস্পৃহা নিস্তেজ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে আপনি একটু চিন্তাফিকর করুন: তাদের আগের ও পরের অবস্থার মধ্যে আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি তাদের আগের অবস্থা দেখবেন যে, তারা স্বতঃস্ফূর্ততা ও গতিময়তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

আর তাদের পরের অবস্থা দেখবেন যে, তারা দুর্বলতা ও নিস্তেজতার কেন্দ্রবিন্দু।

কিন্তু এর কারণ কী?!

কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ হচ্ছে, তাদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী দলীয় চিন্তাচেতনা। তারা দলীয় নির্দেশনা বা সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত ছাড়া নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না! এমনকি তারা পুতুলে পরিণত হয়েছে, যারা কেবল পুতুলওয়ালার হাতের স্পর্শে নড়াচড়া করতে পারে! অথবা দাবার গুটিতে পরিণত হয়েছে, যারা খেলোয়াড়ের আঙুলের ছোঁয়া ছাড়া নড়তে পারে না!

দলীয় উদ্দীপনাই তাদের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে!

তবে কিছু মানুষ এমন আছে, যারা তাদের দলের অধঃপতন ও তিক্ত বাস্তবতা অনুভব করত দলাদলি ও বিভক্তি পরিত্যাগ করে দূরে থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

কিন্তু এটা তাদের উপর কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারেনি; কারণ তারা তাদের সচেতনতার কারণে জানতে পেরেছে যে, তাদের সব কাজের উৎস ও উদ্দীপক হওয়া উচিত **খাঁটি ঈমান**। ফলে তাদের কোনো আমল পরিবর্তন হয়ে যায়নি। তাদের কোনো উপলব্ধি ও প্রয়োগও উল্টো হয়ে যায়নি।

বরং তারা ইসলামের ব্যাপকতার দৃষ্টিতে দেখে এবং উন্মুক্ত ঈমানী উপলব্ধি নিয়ে চলে। এই ব্যাপকতা ও উন্মুক্ত ঈমানের কারণে তারা ঈমানের তারতম্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে মানুষের মধ্যে তারতম্য করে না। তারা দলীয় নেতৃত্বের কারণে মানুষের মধ্যে তারতম্য করে না। বরং তারা শুধু আলেম-উলামা ও বড় বড় ফক্বীহগণের অনুসরণ করে।

প্রথম যুগের শীর্ষব্যক্তিবর্গের অবস্থা ছিল এটাই, যারা বিভক্তির আগে এমনই ছিলেন।

অতএব, আপনাকে এপথই ধরতে হবে, এ থেকে পদস্খলিত হওয়া যাবে না।

আপনি সেসব ভালো মানুষের অনুসরণ করুন, যারা ভালো কাজের আদেশ দিয়েছেন, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন পারস্পরিক সহযোগিতার বেষ্টনী থেকে এবং পরস্পরকে হক্ব ও ছবরের উপদেশের আওতায় থেকে।

আপনি বিখ্যাত ছাহাবী হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে লক্ষ করুন। তার সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেছেন, كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ فِيْ رِجَالٍ مَعَهُ 'তিনি তার সাথের লোকদের মাঝে থেকে ভালো কাজের আদেশ দিতেন'।[১১]

তার এই কাজের উদ্দীপক কী ছিল?

সংকীর্ণ দলাদলি আর সীমাবদ্ধ জোট কি তার উদ্দীপক ছিল নাকি পুণ্য ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা তার উদ্দীপক ছিল?[১২]

প্রথম যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আলেম ও দাঈগণ এই ধারাবাহিকতার উপরই অব্যাহত রয়েছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে এটা শুরু হয়েছে। 'খলকুল কুরআন ফেতনা'র সামনে তার এবং তার সঙ্গীদের বীরত্বগাথা ভূমিকা সকলের নিকট সুবিদিত। তারপর তাতারী ও তাদের ফেতনার বিরুদ্ধে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার ভূমিকার কথাও আমাদের জানা। তিনি, তার সঙ্গীসাথী ও দেশবাসী কীভাবে ফেতনার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন! তার সঙ্গীসাথী ও দেশবাসী কীভাবে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন! বর্তমান উন্নতি ও উৎকর্ষতার এই যুগেও বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে অনেক আলেম-উলামা একই ভূমিকা রেখেছেন। যেমন— আল্লামা আলূসী, আল্লামা কাসেমী, শায়খ মুহাম্মাদ বাহজাত আল-বায়তার, শায়খ আহমাদ শাকের, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়খ ইবনে বায প্রমুখ।

এসব আলেমের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ইসলামের নির্মলতা ও সুন্নাতের স্বচ্ছতার উপর ভিত্তিশীল ছিল। কোনো ধরনের বিরোধিতা বা ধূর্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, যা কিনা দলাদলি, ভেদাভেদ বা বিভক্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে। সেজন্য তাদের সকলের উপর মহান আল্লাহর এ বাণীটি যথাযথ প্রযোজ্য হয়েছিল, ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ 'আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক সৎপথ প্রদর্শন করতেন, যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছিল' *(আস-সাজদাহ, ৩২/২৪)*।

(চলবে)

---

১১. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, ৬/২৮৫।

১২. 'আল-মুনতালাক্ব' প্রণেতার একটি কথায় আশ্চর্য হতে হয়। তিনি বলেছেন, 'তিনি আদেশদাতাদের একটি দল গঠন করেছিলেন'!! উক্ত কথাই তার বক্তব্য খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট।

কিতাবুল ঈমান

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২৮তম পর্ব)

ভূমিকা : দীর্ঘ ২০ পর্ব যাবৎ আমরা ছহীহ বুখারীর ‘কিতাবুল অহী’-এর হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানলাম। এই পর্ব থেকে আমরা ছহীহ বুখারীর দ্বিতীয় অধ্যায় ‘কিতাবুল ঈমান’-এর হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা শিখব ইনশা-আল্লাহ। তবে ‘কিতাবুল ঈমান’-এর হাদীছগুলোর সরাসরি ব্যাখ্যায় যাওয়ার পূর্বে কিতাবুল ঈমানে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ সার্বিক যে বিষয়গুলো আলোচনা করবেন, তা বুঝার সুবিধার্থে ভূমিকাস্বরূপ ঈমানসংক্রান্ত কিছু আলোচনা জেনে রাখা জরূরী। উক্ত ভূমিকাস্বরূপ আলোচনায় আমরা যে বিষয়গুলো জানব তা নিম্নরূপ—

(১) অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা (২) ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩) অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা (৪) মৌলিক আক্বীদাসূহ (৫) ঈমানের ফযীলত (৬) ঈমান না আনার ভয়াবহতা (৭) মৌলিক ছয়টি আক্বীদার সারমর্ম ব্যাখ্যা (৮) ইমাম বুখারীর আলোচ্য বিষয় (৯) ঈমানের সংজ্ঞা ও মতভেদ (১০) আক্বীদার বাতিল ফেরক্বাসমূহ (১১) আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা ও মানহাজ (১২) আক্বীদা ও বিশ্বাসের উপর লিখিত সালাফগণের কিতাবসমূহ।

উক্ত ভূমিকা আলোচনার পর আমরা ছহীহ বুখারীর হাদীছসমূহের ব্যাখ্যায় প্রবেশ করব ইনশা-আল্লাহ। *ওমা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহিল আলিঈল আযীম।*

(১) অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা : ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম অহীর আলোচনা করেছেন। কেননা সকল সত্যের উৎস একমাত্র অহী। অকাট্য সত্য একমাত্র আল্লাহর অহী থেকেই পাওয়া সম্ভব। নবীগণের যাত্রাও শুরু হয় অহী দিয়ে। ঠিক তেমনি আমাদের রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল অহী দিয়ে। তার সকল দাওয়াতের মূল ভিত্তি অহী। তাই সর্বপ্রথম অহী নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত দিক-নির্দেশনার মধ্যে একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঈমান; ইসলামের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস। তাই ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ ও অহীর পরে সর্বপ্রথম ঈমানের আলোচনা শুরু করেছেন। আমরা যদি সারমর্ম বলি, তাহলে বলতে পারব সকল আমলের ভিত্তি ঈমান। ঈমান না থাকলে আমল কোনো কাজে আসবে না। আর ঈমান ও আমল উভয়ের উৎস অহী। তাই ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ প্রথমে অহীর আলোচনা করেছেন। তারপর ঈমানের আলোচনা এবং এরপর বিভিন্ন আমলের ধারবাহিক আলোচনা শুরু করবেন ইনশা-আল্লাহ।

(২) ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : প্রতিটি আদর্শ ও দ্বীন টিকে থাকে তার বিশ্বাস ও চিন্তাধারার উপর। আজকের বিশ্বেও সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ হচ্ছে চিন্তার যুদ্ধ। যে বিশ্বাস যত বেশি মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারছে, যত বেশি মন জয় করতে পারছে— সেই বিশ্বাসের অনুসারীরাই দিন দিন বাড়ছে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে শয়তানের অনুসারীরা অসংখ্য ইসলামী বিশ্বাস বিরোধী প্রোপাগান্ডা পরিচালনা করে আসছে। যেমন বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র। বস্তুবাদ থেকেই তৈরি হয়েছে নারীর অবাধ স্বাধীনতার নামে অবৈধ যৌনাচার, সমকামিতা, লিঙ্গ পরিবর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন শয়তানী এজেন্ডা। যা মানুষের মন ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করানোর জন্য সকল প্রকার ব্রেন ওয়াশিং পদ্ধতি শয়তানের পূজারীরা গ্রহণ করছে। বস্তুবাদ আমাদের পরিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলো ভেঙে দিচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কও আজ মূল্যায়িত হচ্ছে টাকার উপর ভিত্তি করে। বস্তুবাদ সমাজে তৈরি করেছে চাহিদার লাগামহীনতা, যা মানুষকে পশুকে পরিণত করে দিচ্ছে; যা পূরণ করতে প্রয়োজন টাকার অসম প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পুঁজিবাদের বিকল্প নাই। ফলত একটি চক্রের মতো মানুষ বস্তুবাদী চিন্তাধারা পূরণ করতে গিয়ে যেমন বিকৃত চরিত্রের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি সূদী অর্থনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে; যা তাকে গোলাম বানিয়ে দিচ্ছে স্থায়ীভাবে। পাশাপাশি এই ভঙ্গুর পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন নড়বড়ে পরিবর্তনশীল শাসনব্যবস্থা যা একমাত্র গণতন্ত্র দিতে পারে। ফলত বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র একটি চক্রের মতো পৃথিবী শাসন করছে। তবে যাত্রাটা শুরু হয় মানুষের বস্তুবাদী চিন্তাধারা থেকেই।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

সুতরাং বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার গুরুত্ব সীমাহীন ও অপরিসীম। তাইতো মক্কার দীর্ঘ ১৩ বছর রাসূল ﷺ শুধু মানুষের অন্তরের বিশ্বাস সংস্কার নিয়ে কাজ করেছেন। বস্তুবাদের পরিবর্তে তিনি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন পরকালমুখী। জান্নাতের জন্য দুনিয়া বিসর্জন দেওয়ার এক ব্যতিক্রম সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মদীনাতে। সকল পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিগুলো গড়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ-কেন্দ্রিক। যা একটি মানবিক সমাজে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। যে সমাজে চাহিদার লাগামহীনতা না থাকার ফলে টাকার অসম প্রতিযোগিতা তৈরি হয়নি। ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে তৈরি হয়েছিল সাম্যের অর্থনীতি। সম্পদের সুষম বণ্টন সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছিল উদারতা, সচ্ছলতা ও ন্যায়পরায়ণতা। জান্নাতমুখী সমাজ ও সুষম বণ্টনের অর্থনীতি ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে করেছিল টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী। ন্যায়-ইনছাফের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবিক মূল্যবোধ ও প্রকৃত দৈহিক ও মানসিক সুখ-শান্তির এক অনন্য সমাজ ও রাষ্ট্র। ইসলামের আক্বীদা, আদর্শ ও বিশ্বাসের সবচেয়ে ব্যতিক্রম বিষয়টি হচ্ছে এটি সর্ববিপ্লবী, সর্বগ্রাসী ও অপরিবর্তনীয়। গত ১৪০০ বছরে হাজারো বিপ্লব এসেছে, চলে গেছে কিন্তু ইসলামের বিপ্লব যত কাল ধরে যত বেশি মানুষকে ধরে রাখতে পেরেছে তা অকল্পনীয়। বর্তমানেও যত নতুন নতুন বিশ্বাসের থিউরি দাঁড় করানো হোক সেগুলোও একদিন শেষ হবে। কিন্তু ইসলামের বিশ্বাস টিকে রবে। সকল যুগের জন্য এবং মানবিক জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামের যে গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা তা চিরন্তন। এটা শুধু ভবিষ্যদ্বাণী নয়; এটা ইসলামের বিশ্বাস ও আক্বীদার নিজস্ব সৌন্দর্য ও ক্ষমতা। এমনকি ইসলামের ঘোর শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইসলামের আক্বীদা ও বিশ্বাস এমন একটি কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে যেখানে সংস্কারের কোনো সুযোগ নাই; কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইসলামের বিশ্বাসের এই অপরিবর্তনীয়তা ইসলামের সবচেয়ে বড় শক্তি।

(৩) অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা : ঈমান বা বিশ্বাস অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য ও অজানা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস। যেগুলোর কোনোটাই যুক্তিতর্ক বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এই রকম মৌলিক বিষয় হচ্ছে ছয়টি— আল্লাহ, ফেরেশতা, রাসূল, কিতাব, ভাগ্য, পরকাল। যেহেতু মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, শারীরিক শক্তি, ঘ্রাণশক্তি ইত্যাদির একটা সীমা আছে, সেহেতু মানুষের চিন্তাশক্তি ও মেধাশক্তির ও একটা সীমা আছে। নির্দিষ্ট দূরত্বের বেশি মানুষ যেমন দেখতে, শুনতে ও ঘ্রাণ নিতে পারে না, ঠিক তেমনি নির্দিষ্ট একটা বলয়ের বাইরে মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। মানুষের সকল চিন্তার উৎস তার চোখের সামনে যা সে দেখে তা থেকে। এর বাইরে মানুষের জানারও কোনো উপায় নাই। আজকের অতি আধুনিক বিশ্বে মানুষ চন্দ্র, মঙ্গল বিভিন্ন গ্রহে পৌঁছে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, বিজ্ঞানের এই উন্নয়ন মানুষের অসহায়ত্ব ও শক্তির সীমাবদ্ধতাকে আরো ব্যাপকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে আছে, মহাশূন্যে এই রকম লক্ষ-কোটি অগণিত গ্যালাক্সি আছে— যার মধ্যে আবার মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মতো লক্ষ-কোটি গ্রহ-নক্ষত্ররাজি আছে। মানুষ এখনো তার চোখের সামনে যে বিশাল দিগন্ত জুড়ে নীল আকাশ আছে, তার সরিষার দানা সমপরিমাণও পৌঁছতে পারেনি। কিছুদিন পূর্বে জেমসওয়েব টেলিস্কোপ ১৩৫০ কোটি বছর আগের মহাশূন্যের ছবি ধারণ করেছে। আসলে বিষয়টি হচ্ছে ১৩৫০ কোটি বছর আলোর গতিতে চললে যতদূর যাওয়া যাবে ততদূরের ছবি ধারণ করেছে। যেহেতু আলোর গতিতে ছবিটি আমাদের পর্যন্ত আসতে সময় লাগত ১৩৫০ কোটি বছর সেটিই যখন ক্যামেরার শক্তিতে আমরা অতদূর থেকে ধারণ করতে পারছি তখন সেটি অত বছর আগের ছবি। তাহলে কল্পনা করুন মানুষের ক্যামেরার পাওয়ার যতদূর যেতে পেরেছে ততদূর যেতে মানুষের আলোর গতিতে ১৩৫০ কোটি বছর লাগবে। তাহলে প্রথম আকাশ কতদূরে? কত অক্ষম ও দুর্বল মানুষ! ঠিক তেমনি মানুষ জানে পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবী বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধে মানুষের বসবাস অথচ পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু চিরে কোনো সরলরেখা এপার থেকে ওপারে মানুষ নিয়ে যেতে পারেনি। সুতরাং মানুষের অতি উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানও আল্লাহর সামান্য সৃষ্টি আসমান ও যমীনের রহস্যের ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। এই রকম হাজারো চ্যালেঞ্জ আছে, যা মানুষ ভেদ করতে পারেনি। তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মানুষের রূহ বা জীবন। মানুষকে চিরন্তর ও চিরস্থায়ী করে বাঁচিয়ে রাখতে হলে রূহের রহস্য ভেদ করতে হবে। যার ধারেকাছে আধুনিক বিজ্ঞান যেতে পারেনি। কত দুর্বল মানুষ!

সুতরাং এই দুর্বলতা নিয়ে মানুষ তার অজ্ঞ মেধা ও সীমিত মস্তিষ্কের যুক্তিতর্ক এবং তার অক্ষম বিজ্ঞানের বিজ্ঞান দিয়ে এই মহাবিশ্বের প্রতাপশালী সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানবে, এরপর উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপন করবে— তা হাস্যকর বৈ কিছুই নয়।

সুতরাং এটাই সত্য, ইসলামী বিশ্বাসে যুক্তি অগ্রহণযোগ্য। আক্বীদায় দর্শনশাস্ত্র অগ্রহণযোগ্য। ঈমানে বিজ্ঞান অগ্রহণযোগ্য। এখানে একমাত্র অকাট্য সত্য অহী। আল্লাহর বাণী ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বাণী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বাণী যদি কোনো সময় মানুষের যুক্তিচিন্তা ও বিজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহলে অগাধ আস্থা রাখতে হবে যে, অহীই সত্য। অহীর বিপরীত সব মূর্খতা। হয়তো তার মূর্খতা আজ প্রকাশ পাচ্ছে না; আমাদের মেধা ও জ্ঞানের পরিধির উন্নয়নের ফলে কোনোদিন তা প্রকাশ পেতে পারে।

(৪) মৌলিক আক্বীদাসমূহ : মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোনো শরীক নাই। সত্তাতেও নয়, নাম-গুণেও নয়, কর্মেও নয়, অধিকার বা ইবাদতেও নয়। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও তাঁর বান্দা। তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তাঁর সত্যায়ন করতে হবে, তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা সাধ্যানুযায়ী মানতে হবে, যা থেকে নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করতে হবে, তার আনীত শরীআত ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না।

মহান আল্লাহর রয়েছে অগণিত নাম, অসংখ্য গুণ। তাঁর রয়েছে সত্তাগত গুণ, যেমন উপরে থাকা, চেহারা, দু চোখ, দু হাত, পা ইত্যাদি। অনুরূপ তাঁর রয়েছে কর্মগত গুণ, যেমন তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন, হাসেন, আশ্চর্য হন, খুশী হন, রাগ করেন, আসমান-যমীন সৃষ্টির পরে আরশের উপর উঠেছেন, হাশরের মাঠে আসবেন, রাতের শেষাংশে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন।

মহান আল্লাহ সর্বোচ্চ সত্তা, সম্মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও অবস্থানের দিক দিয়ে তিনি উপরে। সপ্তম আকাশে আরশের উপর আছেন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি। তাঁর যে সমস্ত ছিফাতের কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কোনোরূপ তা'বীল বা দূরবর্তী ব্যাখ্যা এবং তাহরীফ বা বিকৃতি পরিবর্তন এবং তামছীল বা সাদৃশ্যকরণ ছাড়াই প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস করা। যেমন মহান আল্লাহর হাত-পা, ছুরত ও চেহারা আছে তবে তাঁর হাত-পা, ছুরত ও চেহারা তাঁর শানে যেমন মানায় তেমন। ঠিক তেমনি মহান আল্লাহর যে সমস্ত ছিফাতের কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়নি, তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত না করা। তাঁর জন্য এমন সব শব্দ ব্যবহার না করা, যা কুরআন-সুন্নাহয় আসেনি। যেমন মহান আল্লাহর দেহ বা অঙ্গ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা সঠিক নয়। এমন শব্দ কেউ ব্যবহার করলে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তার অর্থ শুদ্ধ প্রমাণিত হলে অশুদ্ধ শব্দ পরিত্যাগ করে শুদ্ধ শব্দে তা ব্যক্ত করা, উদ্দেশ্য সঠিক না হলে উক্ত শব্দ ও অর্থ সবটুকুই পরিত্যাগ করা।

আক্বীদার ক্ষেত্রে জাহমিয়া, মুশাব্বিহা, মুজাসসিমা, মাতুরীদিয়া ও আশ'আরিয়াদের আক্বীদা থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিষয়ে আক্বীদা হচ্ছে, তিনি মাটির তৈরি আদম সন্তান; আমাদের মতো মানুষ। তবে তার নিকট অহী আসত। তিনি গুনাহ থেকে মা'ছূম। অহী গ্রহণ ও পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তিনি কোনো ভুল করেননি। তিনি দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন; বারযাখী জীবনে জীবিত আছেন। আল্লাহ যা জানাতেন তাঁর বাইরে তিনি গায়বের খবর রাখতেন না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ছাহাবীগণ সকলেই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। তাদের সকলের হাদীছ গ্রহণযোগ্য। খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলকে খলীফা রাশেদা হিসেবে গণ্য করা। তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার বিষয়ে চুপ থাকা। তাদের কারো শানে গোস্তাখী করা শীআ ও খারেজীদের বৈশিষ্ট্য।

ঈমান অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম। ঈমান বাড়ে ও কমে। কবীরা গুণাহগার ব্যক্তি কাফের নয় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়; সে ফাসেক্ব মুমিন এবং সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন আবার চাইলে শাস্তি দিয়ে একদিন ঈমানের কারণে জান্নাতে দিবেন। খারেজী ও মুরজিয়াদের আক্বীদা থেকে বেঁচে থাকা।

তাক্বদীরকে মহান আল্লাহর জ্ঞান মনে করা। সেই জ্ঞানকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা এবং ক্ষমতাতেই সবকিছু সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন হয়। সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা তারপর সে বিষয়টিতে আল্লাহর উপর ভরসা করা ও তার ফলকে নিজের তাক্বদীর হিসেবে মেনে নেওয়াটাই ঈমানের অংশ। তাক্বদীরের ক্ষেত্রে আমরা জাবারিয়া ও ক্বাদারিয়াদের আক্বীদা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

জান্নাত, জাহান্নাম, কবর, ক্বিয়ামত, শাফাআতে কুবরা ও ছুগরা, পুলছিরাত, আরশ, কুরসী, লাউহে মাহফূয, কলম, মে'রাজ, হাউয ও কাউছার, খতমে নবুঅত, দাজ্জাল, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ, ইমাম মাহদী, মুমিনগণের মহান আল্লাহকে দেখতে পাওয়া ও কারামাতে আওলিয়া সহ যে সমস্ত বিষয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, তা সবকিছুই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। সার্বিকভাবে কুরআন ও হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে সর্বদা সালাফে ছালেহীনের বুঝকে প্রাধান্য দেওয়া।

(চলবে)

সদুপদেশ হলো দ্বীনের আবশ্যক বিষয়

মূল : উস্তায ড. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আদ-দিমাইজী

অনুবাদ : আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তাআলার জন্য। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার পরিজন এবং তার সকল ছাহাবীর ওপর।

অতঃপর, নিশ্চয় সদুপদেশ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়, যা অন্তরসমূহকে জাগ্রত করে, গাফলতি থেকে উজ্জীবিত করে। আর এটা হলো অন্তরসমূহ ঠিক রাখার এবং অন্তরের রোগসমূহ চিকিৎসা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আর এটা হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের একটি চিহ্ন, যাতে থাকে মানুষকে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করা, আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করা, উপকারী নছীহত করা, যা অন্তরসমূহকে নরম করে দেয়। এর ফলে অন্তরসমূহ নাজাত পাওয়ার জন্য, ভয়ংকর জিনিস থেকে বাঁচার জন্য এবং আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়ার জন্য আমল করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

এটা হতে পারে শোনার মাধ্যমে, সেটা হলো রাসূলগণের নিকটে তাদের রবের পক্ষ থেকে যা অহী করা হয়েছে সেগুলো এবং তাদের জবান থেকে বের হওয়া নছীহতসমূহ, দিক-নির্দেশনা এবং হেদায়াতের কথা শোনা, পড়ার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া। অনুরূপভাবে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সম্পর্কে নছীহতকারী ও দিক-নির্দেশকদের থেকে উপকৃত হওয়া।

আবার এটা কোনো কিছু দেখে উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে হতে পারে। সেটা হলো এই জগতের উপদেশ গ্রহণের স্থান, ঘটনা, বিভিন্ন পরীক্ষা, ভাগ্যের বিধিবিধান ও তার গতিপথ এই জগতে আল্লাহর বিভিন্ন রীতি দেখে চিন্তাভাবনা করা এবং উপদেশ গ্রহণ করার মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হওয়া।

অন্তরসমূহের জন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনের চেয়ে উপদেশের প্রয়োজন কোনো অংশে কম নয়। বরং উপদেশ হলো জ্ঞানার্জনকে সুগম করার একটি পথ। কেননা যখন অন্তর নরম হবে, তখন উপকারী জ্ঞানার্জনের জন্য তার দূরদর্শিতার পথও খুলে যাবে। ফলে অন্তর আনন্দিত ও শান্ত হবে, বিবেক তার খোরাক পাবে এবং অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে। এজন্য পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য হলো উপদেশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ ‘আর অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে দৃষ্টান্ত ও মুত্তাক্বীদের জন্য উপদেশ’ *(আন-নূর, ২৪/৩৪)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ‘হে লোকসকল! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও অন্তরসমূহে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত’ *(ইউনুস, ১০/৫৭)*। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহও ছিল উপদেশ। আল্লাহ তাআলা ইনজীল সম্পর্কে বলেন, ﴿وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ ‘আর আমরা তাকে (ঈসাকে) ইনজীল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো; আর তা ছিল তাঁর সামনে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশস্বরূপ’ *(আল-মায়েদা, ৫/৪৬)*। আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর নাযিলকৃত ফলক সম্পর্কে বলেন, ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ ‘আর আমরা তাঁর জন্য ফলকসমূহে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছিলাম’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৪৫)*।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত কিতাবে অনেক স্থানে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ‘আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর’ *(আন-নূর, ২৪/১৭)*। কুরআন দিয়ে উপদেশ দেওয়া হলো অন্তর নরম হওয়ার, তাতে প্রভাব পড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম এবং উপকৃত হওয়া ও জাগ্রত হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। কেননা কুরআন পুরোটাই হলো উপদেশ।

সদুপদেশকে আল্লাহ তাআলা নবীগণের দাওয়াতের একটি মাধ্যম বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ‘আপনি মানুষকে দাওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব তার পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে বেশি জানেন এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন’ *(আন-নাহাল, ১৬/১২৫)*।

আর এটা হবে যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে ব্যক্তি হক্ব অন্বেষণ করে ও তা পেতে চায়, তাকে হিকমতের সাথে আহ্বান করতে হবে। আবার অনেকে আছে, যারা গাফেল, এবং হক্বের বিপরীত জিনিস নিয়ে ব্যস্ত, তাকে হিকমতের সাথে সদুপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করতে হবে। আবার

অনেকে আছে অবাধ্য ও বিরোধী, তাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করতে হবে। তারপরও তারা যদি যুলমের ওপর অটল থাকে, তাহলে পূর্বের পন্থাগুলোর সাথে কিছু কঠোরতাও করার প্রয়োজন পড়তে পারে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ ‘আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে যুলম করেছে’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৬)*।

আল্লাহ তাআলা তার নবী ﷺ-কে উপদেশ দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার আদেশ করে বলেন, ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ ‘কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে সদুপদেশ দিন এবং তাদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা বলুন’ *(আন-নিসা, ৪/৬৩)*।

আর নবী ﷺ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে নির্দিষ্ট দিনে নছীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্তবোধ না করি।[১] কেননা উপদেশের সৌন্দর্য আসে দুই দিক থেকে— ১. যথাসময়ে হওয়া। যেমন অনাবৃষ্টির পরে বৃষ্টি হওয়া। ২. অবস্থা অনুযায়ী হওয়া।

আর নবী ﷺ-এর প্রসিদ্ধ উপদেশ ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদেরকে এমন উপদেশ দিলেন, যাতে অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ল এবং চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এতে আল্লাহ তাআলার সেই বাণীর সত্যায়ন রয়েছে যাতে তিনি বলেন, ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ‘এতে যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহ, মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে’ *(আয-যুমার, ৩৯/২৩)*। অর্থাৎ ভয়ভীতিতে তাদের শরীর শিউরে উঠে। তারপর আনন্দ, উল্লাস এবং ঐ সত্তার ওপর সুধারণা, যার থেকেই একমাত্র কল্যাণ আসে, সেই সুধারণাতে তাদের অন্তরসমূহ নরম হয়ে যায়। ছাহাবী বলেন, আমরা বললাম, মনে হচ্ছে এটা বিদায়ী ভাষণ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে অছিয়ত করুন। তখন তিনি ﷺ বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করার, (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের) কথা শুনার ও মানার অছিয়ত করছি’।[২]

ছহীহ বুখারীর কিতাবুর রিক্বাক্বসহ হাদীছের অন্যান্য কিতাবসমূহে ছাহাবীগণকে নবী ﷺ-এর উপদেশ দেওয়া সংক্রান্ত অনেক উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে। অনুরূপভাবে ছাহাবা, তাবেঈগণ এবং ইমামগণ থেকে বর্ণিত আছারসমূহে, তাদের জীবনী ও লিখনীতে এধরনের অনেক নযির রয়েছে।

যতই স্বর্ণযুগের নিকটে যাওয়া যাবে, ততই বরকতময় কথার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কেননা সালাফগণের কথা কম হলেও তাতে রয়েছে অনেক বরকত। পক্ষান্তরে তাদের পরবর্তী সময়ে সালাফগণের চেয়ে মর্যাদা, জ্ঞান ও হিকমতে কম ব্যক্তিদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

উপদেশ হলো সর্বযুগে ও সর্বস্থানেই সংস্কারকগণের পদ্ধতি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ‘আর স্মরণ করুন, যখন লুক্বমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে কোনো শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক বড় যুলম’ *(লুক্বমান, ৩১/১৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ‘আর স্মরণ করুন, যখন তাদের একদল বলেছিল, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলেছিল, তোমাদের রবের কাছে দায়িত্বমুক্তির জন্য এবং যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এজন্য’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৬৪)*।

মানুষদেরকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদানকারী, তিনি যেই বিষয়ই শিক্ষা দান করুন না কেন তার কর্তব্য হলো দারসের সময়েই ছাত্র ও তাদের অনুসারীদের জন্য উপদেশের সংক্ষিপ্ত বার্তা দেওয়া এবং যারা সমসাময়িক যোগাযোগ মাধ্যমে আগ্রহী তাদের কর্তব্য হলো, এমন উপদেশের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। কেননা হতে পারে একটি সত্য কথার দ্বারাই আল্লাহ তাআলা গাফেল অন্তরকে খুলে দিতে পারেন এবং সেই অন্তরের মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করতে পারেন। সুতরাং উপকারী কথার বিষয়ে কার্পণ্য করো না। হাসান ইবনু ছালেহ বলেন, যাবীদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আমি একটি কথা শুনেছিলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে আমাকে ৩০ বছর উপকৃত করেছিলেন। এমন কত মানুষ রয়েছে, একটি কথা শুনার মাধ্যমে যাদের দূরদর্শিতা আলোকিত হয়ে গেছে, ফলে তারা জীবনকে পরিবর্তন করে দ্বীনের ওপর অটল থেকেছেন এবং বিভ্রান্তি ও ফাসাদ ছেড়ে দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে সদুপদেশের প্রয়োজন ও গুরুত্ব আরো বেশি। কেননা এই সময়ে বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তি প্রাধান্য বিস্তার করেছে, অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে পড়েছে ও তা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ বিভ্রান্ত মানুষের বিভ্রান্তির মূল কারণ হলো অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া; আত্ম-অহংকার, কম জ্ঞান ও জানা থাকার জন্য নয়। ফলে তারা ইয়াহূদীদের পণ্ডিতদের মতো হয়ে পড়েছে। একারণে অন্তরসমূহকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে যেই বিষয়টি অবহিত করা দরকার সেটি হলো যারা নাস্তিকতার সংশয় সন্দেহ তুলে ধরে, তাদের অধিকাংশের এমনটি হয় অন্তর গাফেল হওয়ার কারণে এবং অন্তরের ওপর

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮২১।
২. তিরমিযী, হা/২৬৭৬, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

মরিচা প্রাধান্য লাভ করার কারণে। তাই তাদেরকে শুরুতেই সদুপদেশ দিয়ে, তারপর প্রমাণ পেশ করাই ভালো হবে। কেননা উপদেশ যখন তার উপকারে আসবে, তখন সেটি সঠিক প্রমাণসমূহ গ্রহণের বাধাকে দূর করে দিবে। আল্লাহ তাআলার এই বাণী নিয়ে চিন্তাভাবনা করো, যেখানে তিনি বলেন, ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ 'সুতরাং আপনি বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৭৬)*। সুতরাং উপদেশ চিন্তাভাবনা করার আগেই হতে হবে। উপদেশের এত প্রয়োজন থাকার পরেও আমরা শুধু সামান্য সংখ্যক সত্যবাদী উপদেশদাতাকেই পাই। বরং উপদেশ দেওয়ার বিষয়টি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যখন এমন তাচ্ছিল্য হয়ে থাকে জ্ঞান ও ফিক্বহের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে, তখন এটা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তারা বলে যে, এগুলো হলো আবেগময় উপদেশ, এটা আমাদের জন্য উপযুক্ত কোনো সূক্ষ্ম ইলমী, গভীর চিন্তানির্ভর, তদন্ত ও অনুসন্ধান করা সম্বোধন নয়। এগুলো শুধু সাধারণ, সরল মানুষদের জন্যই উপযুক্ত। কিন্তু এরা জানে না যে, জ্ঞান ও ফিক্বহের দিকে সম্পৃক্তকারী ব্যক্তিরা এই ধরনের উপদেশের বেশি মুখাপেক্ষী, বিশেষ করে এই পৃথিবীর শেষ সময়ে, যা শক্ত অন্তরকে নরম করে দিবে। কেননা তাদের অনেকের থেকে বারবার এই অভিযোগ আসে যে, তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে।

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ফিক্বহ ও হাদীছ শ্রবণ নিয়ে ব্যস্ত এমন অনেককেই আমি দেখেছি, মর্মস্পর্শী বক্তব্য এবং সালাফে ছালেহীনের জীবনীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু তাদের অন্তর সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয়নি।

কিছু উপদেশদাতার মধ্যে এবং উপদেশবাণীর মধ্যে মিথ্যা কথা, মিথ্যা স্বপ্নের বর্ণনা, ইসরাঈলী বর্ণনা, অসম্ভব ও বিভিন্ন ধরনের কিছু কাহিনী ঢুকে পড়েছে। এগুলোর কারণে এই বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করা সঠিক হবে না। বরং জরুরী ভিত্তিতে এটা এর স্থান ও বিষয়গুলোকে সঠিক ও পরিষ্কার করার দাবি রাখে। আর মিথ্যা ও নতুন উদ্ভাবনকৃত বিষয়গুলো থেকে এই বিষয়টিকে রক্ষা করার জন্য কঠোর নজরদারি করতে হবে, যাতে করে এর উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা আবার ফিরে আসে। আর উপদেশদাতার কর্তব্য হলো, সে যেন উপদেশের শর্ত ও আদবসমূহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, সংবাদ সঠিক কি-না এই দিকে খেয়াল রাখে, সেই সংবাদ হোক কোনো দলীল অথবা কোনো ঘটনা। এছাড়াও তার নিয়্যত যেন সঠিক থাকে। অবস্থা, স্থান ও সময়সহ অন্যান্য বিষয়গুলো যেন বিবেচনা করে, যাতে করে আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে এর ফলাফল আসে।

উপদেশ পরিত্যাগ করা এবং উপদেশদাতাকে তাচ্ছিল্য করাটা শুধু আমাদের এই যুগের ঘটনা নয়। বরং এটা পূর্ব যুগ থেকেই চলে আসছে। এটা হলো রাসূলগণ ও সংস্কারকদের বিরোধীদের রীতি। তারা এটাকে হক্ব শোনা ও তা দিয়ে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাকার একটি মাধ্যম বানিয়েছে। পবিত্র কুরআনে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা হূদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি তাঁর জাতিকে (আদ জাতি) নছীহত করলেন, আর তিনি তাদেরকে বলেছিলেন,﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ 'আমি তোমাদের ওপর এক মহান দিনের আযাবের ভয় করছি' *(আশ-শুআরা, ২৬/১৩৫)*। তখন তাঁর জাতির লোকদের উত্তর ছিল, ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ * إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ 'তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও বা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। এটা তো কেবল পূর্ববর্তীদেরই চরিত্র' *(আশ-শুআরা, ২৬/১৩৬-১৩৭)*।

এটা হলো শয়তানের একটি প্রবেশপথ ও আলেমদেরকে ওয়াসওয়াসা দেওয়ার একটি মাধ্যম। ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমদেরকে দেওয়া শয়তানের ওয়াসওয়াসার অন্তর্ভুক্ত হলো, সে তাদের সামনে উপদেশদাতাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বিষয়টিকে সুন্দর করে তুলে ধরে এবং তাদের নিকট উপস্থিত হতে বাধা দেয়। ফলে তারা উপদেশদাতাকে বলে, এরা তো কাহিনী বর্ণনাকারী! এখানে শয়তানের উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন এমন স্থানে উপস্থিত না হয়, যেখানে তাদের অন্তর নরম ও ভীত হবে। قُصَّاص বা কাহিনী বর্ণনাকারী এটা নামের দিক থেকে কোনো নিন্দনীয় নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ 'আমরা আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি' *(ইউসুফ, ১২/৩)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ﴾ 'আপনি তাদের সামনে কাহিনী বর্ণনা করুন' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৭৬)*। কিন্তু এর মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনাকারীদের নিন্দা করা হয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ইলমী দিক বর্ণনা না করে শুধু বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করে। তারপর তাদের অধিকাংশরাই যেই বর্ণনা করে সেগুলোর মধ্যে মিথ্যা বর্ণনাও যোগ করে দেয়। আবার তারা যেই বর্ণনার ওপর নির্ভর করে, সেগুলোর বেশিরভাগই অসম্ভব। পক্ষান্তরে কাহিনী যদি সত্য হয় এবং তা উপদেশ হয়, তাহলে সেটি প্রশংসনীয়। আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলতেন, মানুষ সত্যবাদী কাহিনী বর্ণনাকারীর কতই না মুখাপেক্ষী!

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের অন্তর ও আমলসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সংশোধন করে দেন, আমাদেরকে যেন সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং আমাদেরকে যেন উপকারী জ্ঞান ও সৎ আমল করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

ছালাত, সালাম ও বরকত নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন এবং সকল ছাহাবীর ওপর।

যুবসমাজের অধঃপতনের কারণ ও উত্তরণের উপায়

-মাহবূবুর রহমান মাদানী*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অধঃপতন, বিপথগামিতা, অবক্ষয় ও বিচ্যুতির কারণ :

(১) কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও দূরে সরে যাওয়া : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ‘এ কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার’ *(আল-ইসরা, ১৭/৯)*। সুতরাং কুরআন সত্যিকার অর্থেই এমন পথের দিক নির্দেশনা দেয়, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ ও বিপদমুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে বলেছেন, তিনি বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ‘আমি তোমাদের মধ্যে দু’টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু’টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হবে না, তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ’।[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ جَعَلَ القرآن إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ ‘যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রাখে তা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে কুরআনকে পিছনে রাখে তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে’।[২]

(২) ছহীহ সুন্নাহসম্মত জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ‘আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না’ *(আল-মায়েদা, ৫/১০৩)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ ‘আল্লাহর সাহায্য সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের সাথেই রয়েছে’।[৩]

(৩) লজ্জাহীন হওয়া : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ‘অতীতের নবীগণের কাছ থেকে মানুষ একথা জানতে পেরেছে যে, যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে’।[৪]

(৪) গান-বাজনা ও অশ্লীলতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ‘কতক মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশত, অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে এবং আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদের জন্যই আছে অবমাননাকর শাস্তি’ *(লুক্বমান, ৩১/৬)*।

অবান্তর কথাবার্তা হলো, এমন সব বিনোদন বা অপ্রয়োজনীয় কাজ ও খেলা যা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল ও অমনোযোগী করে রাখে। আর যে সমস্ত বিনোদন ও খেলায় কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেসবই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ।

উত্তরণের উপায় :

(১) অনর্থক, অপ্রয়োজনীয় ও সন্দেহমুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করে চলা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ‘কোনো ব্যক্তির সুন্দর ইসলামের পরিচয় হলো, অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করে চলা’।[৫] আর কোনো বিষয়ে যদি সন্দেহ হয় এটা হালাল না হারাম, তাহলে তা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়’। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ‘সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো’।[৬]

(২) আল্লাহকে সর্বাবস্থায় ভয় করা এবং প্রত্যেক মন্দ ও খারাপ কাজের পরই ভালো কাজ করা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ‘তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক মন্দ ও খারাপ কাজের পর ভালো কাজ করো, যা তাকে অর্থাৎ পাপকে মুছে দেবে আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো’।[৭]

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৩৩৮, ৫/১৩২৩; মিশকাত, হা/১৮৬, হাসান।

২. ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১২৪; সিলসিলা ছহীহা, হা/২০১৯।

৩. তিরমিযী, হা/২১৬৬।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৮৪।

৫. ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৭৬; মিশকাত, হা/৪৮৩৯, হাদীছ ছহীহ।

৬. নাসাঈ, হা/৫৭১১; মিশকাত, হা/২৭৭৩, হাদীছ ছহীহ।

৭. তিরমিযী, হা/১৯৮৭, হাদীছ ছহীহ।

(৩) দ্বীন ও নৈতিকতা শিক্ষা করা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলিমের ওপর দ্বীন শিক্ষা করা ফরয’।[৮] আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كَيْفَ أَنْتَ يَا عُوَيْمِرُ إِذَا قِيلَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعَلِمْتَ أَمْ جَهِلْتَ فَإِنْ قُلْتَ عَلِمْتُ قِيلَ لَكَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ وَإِنْ قُلْتَ جَهِلْتُ قِيلَ لَكَ فَمَا كَانَ عُذْرُكَ فِيمَا جَهِلْتَ أَلَا تَعَلَّمْتَ ‘হে উমাইর কী অবস্থা তোমার! ক্বিয়ামতের দিন যখন তোমাকে বলা হবে, তুমি বিদ্যা অর্জন করেছিলে না মূর্খ ছিলে? যদি উত্তরে তুমি বল, আমি জ্ঞান অর্জন করেছিলাম, তখন তোমাকে বলা হবে, তুমি কী আমল করেছিলে, যে বিষয়ে বিদ্যা অর্জন করেছিলে? আর যদি তুমি বল, মূর্খ ছিলাম, তাহলে তোমাকে বলা হবে, যে বিষয়ে তুমি মূর্খ ছিলে তার ব্যাপারে তোমার ওযর কী ছিল যে, তুমি জ্ঞান অর্জন করতে পারনি?।[৯]

(৪) কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে আলেমদের জিজ্ঞেস করা : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ‘তোমরা যদি না জান, তবে কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো’ *(আন-নাহল, ১৬/৪৩; আল-আম্বিয়া, ২১/৭)*।

(৫) ভালো বন্ধু নির্বাচন করা : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ‘মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে’।[১০] আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ‘তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন কেবল পরহেযগার লোক খায়’।[১১] আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً ‘সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিসক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর ক্রয় করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে’।[১২] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ‘মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালোবাসবে (ক্বিয়ামতের দিন) সে তারই সঙ্গী হবে’।[১৩]

(৬) যেখানে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা হয় এমন স্থান পরিত্যাগ করা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ‘তোমরা নারীদের কাছে প্রবেশ করা হতে বিরত থাকো’।[১৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ‘কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে গোপনে অবস্থান না করে। কারণ শয়তান উভয়ের তৃতীয় জন (কুটনি) হয়’।[১৫] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ‘আল্লাহর শপথ! রাসূল ﷺ-এর হাত কখনো স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মহিলার হাত স্পর্শ করেনি’।[১৬]

(৭) যথাসময়ে বিবাহ করা : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‘হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে যে সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের সর্বাধিক সংরক্ষণ করে। আর যে সক্ষম নয়, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা তা তার জন্য ঢালস্বরূপ’।[১৭]

(৮) অবসর সময় ভালো কাজে ব্যয় করা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ ‘দু’টি নেয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ অমনোযোগী; একটি সুস্থতা অপরটি অবসর’।[১৮] রাসূলুল্লাহ ﷺ এক

৮. শুআবুল ঈমান, হা/১৫৪৭, হাদীছটি ছহীহ।
৯. বাগিয়্যাতুল বাহিছ আন যাওয়ায়িদি মুসনাদিল হারিস, হা/১১২৪।
১০. আবূ দাঊদ, হা/৪৮৩৩; তিরমিযী, হা/২৩৭৮, হাসান।
১১. আবূ দাঊদ, হা/৪৮৩২; মিশকাত, হা/৫০১৮, হাসান।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/২১০১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২৮।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪০।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭২।
১৫. তিরমিযী, হা/১১৭১; মিশকাত, হা/৩১১৮, হাদীছ ছহীহ।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৬৬।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০০।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২।

লোককে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ‘তুমি পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনীমত বা সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও তোমার অসুস্থতা আসার পূর্বে, তোমার সচ্ছলতাকে কাজে লাগাও অসচ্ছলতার পূর্বে, তোমার অবসরকে কাজে লাগাও তোমার ব্যস্ততার পূর্বে এবং তোমার হায়াত বা জীবনকে কাজে লাগাও তোমার মৃত্যু আসার পূর্বে’।[১৯] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ،عَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ‘ক্বিয়ামতের দিনে পাঁচটি বিষয় (অবস্থা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ বা প্রশ্নোত্তর হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পা আল্লাহর তাআলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার মধ্যে একটি হলো তার যৌবনকাল (শক্তি) সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে’।[২০]

অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজেদের মূল্যবান জীবনকে উপকারবিহীন অনর্থক কাজে নষ্ট করে।

৯. সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করা ও ধূমপান থেকে বিরত থাকা : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ ‘ছালাত প্রতিষ্ঠা করো; নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ (বিষয়)। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। ফলে কোনো ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি যে কোনো অন্যায় কাজে জড়িত হয় না, দুর্নীতি করে না, রাষ্ট্রের মাল আত্মসাৎ করে না। আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ‘আমার দোস্ত (রাসূল ﷺ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, ‘তুমি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং ইচ্ছা করে কোনো ফরয ছালাত পরিত্যাগ করবে না। যে ইচ্ছা করে তা পরিত্যাগ করবে তার থেকে নিরাপত্তা উঠে যাবে। আর মদপান করবে না। কেননা তা হচ্ছে সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি’।[২১]

যুবকদের দ্বীনদারিতার একটি নমুনা :

আছহাবে কাহফের ঘটনা : তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা সত্য দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঈমান আনে এবং দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের জাতি থেকে পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নেয় এই ভয়ে যে, না জানি তাদের স্বজাতির লোকেরা তাদেরকে সঠিক দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। তৎকালীন বাদশা ছিল দাকইয়ানুস, সে ছিল শিরকী ভাবাপন্ন এবং মূর্তিপূজক। আর সেই যুবকরা এই মূর্তিপূজাকে মানতে পারেনি বলেই তারা তাদের দ্বীন রক্ষার জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে, যাতে তাদের দ্বারা কোনো শিরক না হয়ে যায়। সেখানে তারা প্রার্থনায় বলেছিল, হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আমাদেরকে আমাদের জাতি হতে লুকিয়ে রাখুন এবং আমাদের এই কাজের ফলাফল ভালো করুন। আর আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে তাদের মনোবলকে দৃঢ়চিত্ত করে দিলেন যাতে তারা ভয় না পায়। অতঃপর তারা সেখানে ঘুমিয়ে যায় আর এই অবস্থায়ই তাদের ৩০৯ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা এমন অবস্থায় তাদেরকে জাগ্রত করেন যে, তাদের মধ্যে কোনো প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ফলে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আমরা কত সময় ঘুমিয়ে ছিলাম? উত্তরে বলা হয়, একদিন বা একদিনেরও কিছু কম। এটা বলার কারণ হলো, যখন তারা ঘুমিয়ে যায় তখন ছিল সকাল, আর যখন জেগে উঠে তখন ছিল সন্ধ্যা। তাই তারা সূর্যের ওপর অনুমান করে এ কথা বলেছে। অতঃপর তারা তাদের ক্ষুধা মিটানোর জন্য কিছু খাদ্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্য থেকে একজনকে মুদ্রাসহ বাজারে পাঠায়। আর তাকে বলে দেয়, সে যেন জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে খুব সাবধানতার সাথে এ কাজ করে। যাতে করে কেউ আমাদের বিষয় জানতে না পারে। যদি তারা আমাদের খবর জানে তাহলে তারা আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবে এবং আমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে *(আল-কাহফ, ১৮/৯-২১)*।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন- আমীন!

১৯. শুআবুল ঈমান, হা/৯৭৬৭; হাকেম, হা/৭৮৪৬।

২০. তিরমিযী, হা/১৪১৬, হাসান; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৪৬।

২১. ইবনু মাজাহ, হা/৪০৩৪, হাসান।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ
*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(জুন'২৩ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৪)

৪. ঈমানের শাখা-প্রশাখা :

ঈমানের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে, ঈমান শব্দটি যখন আলাদাভাবে ব্যবহার করা হবে, তখন তা দ্বীনের সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। নবী করীম ﷺ ঈমানের শাখা-প্রশাখাগুলো সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত পরিসরে বর্ণনা করেছেন।

সংক্ষিপ্ত পরিসর হলো, যেমনটা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ وفي رواية الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ 'ঈমানের শাখা ৭০টির চেয়েও বেশি, আর লজ্জাশরম ঈমানের একটি শাখা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ঈমানের শাখা ৭০টিরও কিছু বেশি অথবা ৬০টির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই) একথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা'।[১]

ইমাম আবূ বকর আল-বায়হাক্বী 'ঈমানের ৭৭টি শাখা-প্রশাখা উল্লেখ করেছেন'।[২] এই শাখা-প্রশাখাগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আসছে :

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান।
(২) রাসূলগণের প্রতি ঈমান।
(৩) ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান।
(৪) কুরআনুল কারীম ও সমস্ত নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান।
(৫) আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো ও মন্দ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান।
(৬) শেষ দিবসের প্রতি ঈমান।
(৭) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান।
(৮) কবর থেকে পুনরুত্থানের পরে হাশরের মাঠে সকল মানুষকে একত্রিতকরণের প্রতি ঈমান।
(৯) ঈমান বা বিশ্বাস রাখা যে, মুমিনদের আবাস হবে জান্নাত এবং কাফেরদের আবাস হবে জাহান্নাম।
(১০) আল্লাহকে ভালোবাসার আবশ্যকতার প্রতি ঈমান।
(১১) আল্লাহকে ভয় করার আবশ্যকতার প্রতি ঈমান'।[৩]
(১২) আল্লাহর নিকট থেকে আশা করার আবশ্যকতার প্রতি ঈমান।
(১৩) আল্লাহর নিকট ভরসা করার আবশ্যকতার প্রতি ঈমান।
(১৪) নবী ﷺ-কে ভালোবাসার আবশ্যকতার প্রতি ঈমান।
(১৫) কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াই নবী করীম ﷺ-কে সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা করার আবশ্যিকতার প্রতি ঈমান।
(১৬) দ্বীনের প্রতি ব্যক্তির ভালোবাসা এমনকি কুফরী করার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার নিকট অধিক প্রিয় হবে।
(১৭) ইলম অন্বেষণ করা। তা হলো— প্রমাণাদি সহকারে আল্লাহকে, তাঁর দ্বীন ও নবী করীম ﷺ-কে জানা।
(১৮) ইলম প্রচার করা ও মানুষকে তা শিক্ষা দেওয়া।
(১৯) কুরআনুল কারীমকে সম্মান করা, কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, তাঁর সীমারেখা ও বিধানাবলি রক্ষা করা, হালাল-হারাম জানা, তার ধারক-বাহককে সম্মান করা ও মুখস্থ করার মাধ্যমে'।[৪]
(২০) পবিত্রতা অর্জন ও ওযূর যত্ন নেওয়া।
(২১) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথারীতি আদায় করা।
(২২) যাকাত প্রদান করা।
(২৩) ফরয ও নফল ছিয়াম পালন করা।
(২৪) ই'তিকাফ করা।
(২৫) হজ্জ করা'।[৫]
(২৬) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।
(২৭) আল্লাহর রাস্তায় সীমানা পাহারা দেওয়া।
(২৮) শত্রুর বিপক্ষে অনড় থাকা এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন না করা।

---

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শব্দ বিন্যাস মুসলিমের, ছহীহ বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ঈমানের বিষয়সমূহ' অনুচ্ছেদ, ১/১০, হা/৯; ছহীহ মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা, তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার বর্ণনা, লজ্জা-শরমের ফযীলত এবং তা ঈমানের অঙ্গ হওয়ার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, ১/৬৩, হা/৩৫।

২. ঈমানের এই ৭৭টি শাখা-প্রশাখা তিনি সাত খণ্ডের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলো সনদসহ হাদীছের মাধ্যমে চমৎকার ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

৩. ইমাম বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থের ১ম খণ্ডে এই শাখা-প্রশাখাগুলো রয়েছে, ১/১০৩-৪৬৩।

৪. ১২-১৯ নম্বর পর্যন্ত এই শাখাগুলো ইমাম বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থের ২য় খণ্ডে রয়েছে, ২/৩-৫৪৮।

৫. ২০-২৫ নম্বর পর্যন্ত এই শাখাগুলো ইমাম বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে রয়েছে, ৩/৩-৪৯৪।

(২৯) ইমাম অথবা বিজয়ীদের প্রতিনিধির নিকট গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া।
(৩০) আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে গোলাম (দাস) আযাদ করা।
(৩১) পাপের কারণে আবশ্যক কাফফারাসমূহ। সেগুলো কুরআন ও হাদীছে বিদ্যমান চারটি— (ক) হত্যার কাফফারা, (খ) যিহারের (স্বামী স্ত্রীকে বলা তোমার পিঠ আমার মায়ের মতো) কাফফারা, (গ) শপথের কাফফারা এবং (ঘ) রামাযানের ছিয়াম রাখা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা।
(৩২) চুক্তিসমূহ পূর্ণ করা।
(৩৩) আল্লাহর নেয়ামতরাজি গোনা এবং এই নেয়ামতরাজির যে প্রশংসা আবশ্যক তার হিসাব করা।
(৩৪) অপ্রয়োজনীয় বিষয় হতে জিহ্বা সংযত রাখা।
(৩৫) আমানত সংরক্ষণ করা এবং তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার আবশ্যকতা।
(৩৬) মানুষ হত্যা করা ও তাঁর ক্ষতি করা হারাম।
(৩৭) অবৈধভাবে লজ্জাস্থান ব্যবহার করা হারাম এবং তা পবিত্র রাখা ওয়াজিব।
(৩৮) হারাম সম্পদ হতে হাত গুটিয়ে রাখা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো, চুরি করা, ছিনতাই করা, ঘুস খাওয়া ও শারঈভাবে যা তার প্রাপ্য নয় তা খাওয়া হারাম'।[৬]
(৩৯) খাদ্য ও পানীয়তে আল্লাহভীরুতা আবশ্যক এবং যা হালাল নয় তা থেকে বিরত থাকা।
(৪০) হারাম ও (মাকরূহ) অপছন্দনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও থালা-বাসন পরিহার করা।
(৪১) শরীআতবিরোধী আনন্দ-বিনোদন ও খেল-তামাশা হারাম।
(৪২) মিতব্যয়ী হওয়া। আর অন্যায়ভাবে সম্পদ খাওয়া হারাম।
(৪৩) হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা।
(৪৪) মানুষের মান-সম্মান অন্যের জন্য হারাম এবং তাতে পতিত না হওয়া আবশ্যক।
(৪৫) বিশুদ্ধ নিয়্যতে একমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করা ও লৌকিকতা পরিহার করা।
(৪৬) ভালো কাজ নিয়ে খুশি হওয়া ও মন্দ কাজ নিয়ে বিষণ্ন হওয়া।
(৪৭) তওবাতুন নাছূহার মাধ্যমে সমস্ত পাপের চিকিৎসা/প্রতিরোধ করা।
(৪৮) কুরবানীসমূহ তথা আল্লাহর নৈকট্যমূলক উৎসর্গসমূহের সমষ্টি হলো, হজ্জ ও ঈদুল আযহার পশু যবেহ ও আক্বীক্বা করা'।[৭]
(৪৯) শাসকদের আনুগত্য করা।
(৫০) জামাআত বা দল যার উপরে আছে তা আঁকড়ে ধরা।
(৫১) মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করা।
(৫২) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।
(৫৩) সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করা।
(৫৪) লজ্জাশীলতা।
(৫৫) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা।
(৫৬) আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
(৫৭) উত্তম চরিত্র।
(৫৮) ক্রীতদাস বা অধীনস্তদের সাথে সুন্দর আচরণ করা।
(৫৯) ক্রীতদাসের উপর মুনিবের অধিকার।
(৬০) পরিবার ও সন্তানসন্ততির অধিকার আদায় করা।
(৬১) দ্বীনদারদের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। সালাম প্রচার-প্রসার করা এবং মুছাফাহা করা।
(৬২) সালামের উত্তর দেওয়া।
(৬৩) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া'।[৮]
(৬৪) আহলুল ক্বেবলার (যারা মুসলিম দাবি করে এবং কা'বার দিকে ক্বেবলামুখী হয়) কেউ মারা গেলে তার জানাযার ছালাত আদায় করা।
(৬৫) হাঁচিদাতার (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) 'আল-হামদুল্লিাহ' বলার জবাবে (يَرْحَمُكَ اللّٰهُ) 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।
(৬৬) কাফের ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের থেকে দূরে থাকা এবং তাদের উপর অনমনীয় হওয়া।
(৬৭) প্রতিবেশীকে সম্মান করা।
(৬৮) মেহমানকে সম্মান করা।
(৬৯) পাপিষ্ঠদের পাপ গোপন করা।
(৭০) বিপদাপদ ও আত্মা যে উপভোগ এবং কামনা-বাসনার প্রতি আগ্রহী হয় তার থেকে ধৈর্যধারণ করা।
(৭১) দুনিয়াবিমুখ হওয়া ও অল্প আশাবাদী হওয়া।
(৭২) আত্মসম্মানবোধ থাকা।
(৭৩) বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থাকা।
(৭৪) দানশীলতা ও বদান্যতা থাকা।
(৭৫) ছোটদের স্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা করা।
(৭৬) পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করা।
(৭৭) ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং তার জন্য তাই অপছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা; হাদীছে যার দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে'।[৯]

(চলবে)

৬. ২৬-৩৮ নম্বর পর্যন্ত এই শাখাগুলো ইমাম বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে রয়েছে, ৪/৩-৩৯৮।
৭. ৩৯-৪৮ নম্বর পর্যন্ত এই শাখাগুলো ইমাম বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে রয়েছে, ৫/৩-৪৮৫।
৮. ৩৯-৬৩ নম্বর পর্যন্ত এই শাখাগুলো ইমাম বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে রয়েছে, ৬/৩-৫৪৭।
৯. ৬৩-৭৭ নম্বর পর্যন্ত এই শাখাগুলো ইমাম বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে রয়েছে, ৩/৩-৫৪০।

রহস্যে ভরা কান ও আধুনিক বিজ্ঞান

-মো. হারুনুর রশীদ*

কান মহান আল্লাহর এক অপার সৃষ্টি। কানের ভেতরে রয়েছে প্রায় ১ লক্ষ শ্রবণকোষ। এ শ্রবণকোষগুলো মস্তিষ্কে শব্দ প্রেরণ করে এবং শ্রবণকার্য সম্পন্ন হয়। মহান আল্লাহ কানের প্রবেশমুখে এক ধরনের কটু স্বাদের ময়লা থাকার ব্যবস্থা করেছেন। সে কটু গন্ধ ও বিস্বাদ ময়লা থাকার কারণে কোনো কিট কানে ঢুকতে পারে না। আবার দেখুন! কানের বন্ধ পথটা শামুকের উদর পথের মতো ঘোরানো করে তৈরি করেছেন। তাতে বাইরের শব্দ ওই প্যাঁচের মাঝে বাধা পেয়ে ধীরে প্রগাঢ় ও গম্ভীর হয়। শেষে উঁচু আওয়াজ কর্ণকুহরে ঢোকে। আকৃতিটি ফানেলের মতো হওয়ার কারণে শব্দ একসাথে প্রবেশ করে কানের পর্দার ক্ষতি করতে পারে না। রন্ধ্র পথটা প্যাঁচালো হওয়াতে ঘুমন্ত অবস্থায় পিঁপড়া বা পোকা একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারে না। ঘোরানো পথ পেরুতেই তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে আমরা জেগে ওঠি। তারপর প্রতিরোধে সমর্থ হই। মহান আল্লাহ তাঁর এ আশ্চর্য সৃষ্টিগুলোকে তার নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক আব্দুর রাযযাক নওফেল-এর ‘আধুনিক বিজ্ঞান ও আল্লাহ’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘মানুষের কানের একটি অংশ (অর্থাৎ কানের ভেতরের অংশ) প্রায় ৪ হাজার সূক্ষ্ম ও জটিল বক্র যন্ত্রের সমষ্টি। এর প্রত্যেকটি যন্ত্র ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে ধারাবাহিকভাবে এক সাথে বাঁধা। বলা যেতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র যন্ত্রগুলো বাদ্যযন্ত্র সদৃশ। মনে হয়, এটি এমন একটি হাতিয়ার, যা মেঘের গর্জন থেকে শুরু করে গাছের পাতার মর্মরধ্বনি পর্যন্ত এবং বাদ্যযন্ত্রের মিহি সুর পর্যন্ত সকল তীব্র বা মৃদু শব্দকে মগজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়’। আল্লাহ আমাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ‘আপনিই বলুন, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কান, চোখ ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না’ *(আল-মুলক, ৬৭/২৩)*।

কানের কাজ ও গঠন :

কানের প্রধান তিনটি অংশ। যথা— (১) বহিঃকর্ণ বা বাইরের কান, (২) মধ্যকর্ণ বা মাঝের কান এবং (৩) অন্তঃকর্ণ বা ভিতরের কান।

(১) বহিঃকর্ণ : কান বলতে আমরা সাধারণভাবে যা দেখি, সেটা মূলত বহিঃকর্ণ। এটির আবার দুটো অংশ রয়েছে। একটা হচ্ছে কানের পাতা, যা তরুণাস্থি ও চামড়া দিয়ে গঠিত। আরেকটা হচ্ছে কানের বাইরের ছিদ্রপথ বা এক্সটারনাল অডিটরি ক্যানেল। এই ছিদ্রপথের বাইরের এক-তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি ও চামড়া দিয়ে গঠিত। আর ভিতরের দিকের দুই-তৃতীয়াংশ অস্থি চামড়া দিয়ে গঠিত। এই ছিদ্রপথ একটা আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গের মতো। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে রয়েছে কানের পর্দা বা টিমপেনিক মেমব্রেন। এই অন্ধ গলিপথটি আঁকাবাঁকা থাকায় কানের পর্দায় সহজে বাইরের আঘাত এসে লাগে না।

কাজ : এই অংশের কাজ হচ্ছে বাইরের শব্দতরঙ্গ যা আমাদের কানে পৌঁছে, তাকে মধ্যকর্ণের দিকে পরিচালিত করা। এছাড়া সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কানের এই অংশের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

(২) মধ্যকর্ণ : মধ্যকর্ণে রয়েছে কানের পর্দা বা টিমপ্যানিক মেমব্রেন এবং ছোট ছোট তিনটি হাড়। কানের পর্দা বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণের মধ্যে অবস্থিত। এটি একটি পাতলা পর্দা, যা একটি প্রায় গোলাকার হাড়ের রিং দিয়ে টানটান অবস্থায় থাকে। মধ্যকর্ণে অডিটরি টিউব নামে একটি নালি থাকে, যা নাকের ভিতরের অংশে ন্যাসোফ্যারিংস এর সাথে মাঝের কানের সংযোগ রক্ষা করে। খাওয়ার সময় বা ঢোক গেলার সময় এই নলের মুখ খুলে যায় ও হাওয়া ঢোকে। মধ্যকর্ণের ভিতরে সবসময় কিছু বাতাস থাকে। এই হাওয়া বাইরের পারিপার্শ্বিক বায়ুচাপের সঙ্গে মধ্যকর্ণের সমতা রক্ষা করে। এই বায়ুচাপের ভারসাম্যের হেরফের হলেই মধ্যকর্ণে অসুবিধা দেখা দেয়। এছাড়া মধ্যকর্ণে রয়েছে মাস্টয়েড

* ফরক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।

বায়ুকোষ প্রণালির মুখ। মাস্টয়েড কোষে টিমপেনিক ক্যাভিটির মতো বাতাস থাকে। এই বাতাস অডিটরি নালি দিয়ে ঐ জায়গাতে যায়।

কাজ : শোনার ক্ষেত্রে কানের এই অংশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বায়ুর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ কানের পর্দার ওপর পড়ে। তরঙ্গের ধাক্কায় কানের পর্দা আন্দোলিত হয় এবং এর ভিতরের গায়ে লেগে থাকা ছোট ছোট হাড়গুলোতে তা ছড়িয়ে দেয়। এভাবেই মধ্যকর্ণ থেকে শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণে গিয়ে পৌঁছে।

(৩) অন্তঃকর্ণ : কানের ভিতরের এই অংশটি অনেকটা শামুকের খোলের মতো অস্থি দিয়ে গঠিত। অস্থির ভিতরে আছে পর্দার মতো বস্তু। এর তিনটি অংশ রয়েছে। যথা- (ক) কর্ণমুখ (ভেসটিবিউল), (খ) অর্ধবৃত্তাকার নালিপথ (সেমিসারকুলার ক্যানেল) এবং (গ) শ্রবণযন্ত্র (ককলিয়া)।

কাজ : কানের ভিতরের এই অংশে এসে শব্দতরঙ্গ বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিণত হয়। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গগুলো মস্তিষ্কে পৌঁছলে আমরা শুনতে পাই। এছাড়া এই অংশে যে যন্ত্রাদি রয়েছে, তার সাহায্যে মানুষ নিজের ভারসাম্য রক্ষা করা, চলাফেরা করা, দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, চরকির মতো কিছুক্ষণ ঘোরার পর স্থির হয়ে দাঁড়ানো যায় না, মাথা ঘুরতে থাকে। এর পিছনে যে কারণ দায়ী তা হলো, ক্রমাগত ঘোরার ফলে ফেসটিবিউল বা কর্ণমূলে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, তার জের বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনুভূত থাকে। আর তাতেই মাথা ঘোরে। ভেসটিবিউলের ত্রুটি কিংবা অস্বাভাবিক থাকলে একই উপসর্গ দেখা দেয়।

আল-কুরআনে কানের মাহাত্ম্য :

স্বাভাবিকরূপে অথবা বৈজ্ঞানিক ধারায় যে কোনোভাবে চিন্তা করলেই কানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। চোখ না থাকলেও যেমন দুনিয়া অন্ধকার, কান না থাকলেও তেমনি মনে হয় দুনিয়া নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। অতি জটিল ও অতি সূক্ষ্ম খিলেনের সমবায়ে গঠিত এই কান। অতি মূল্যবান এই শ্রবণেন্দ্রিয় তথা কানের নেয়ামতমান সম্পর্কে আজ অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। আল্লাহর পবিত্র সত্তার পরিচয় লাভ, তার সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে যথার্থ চিন্তা ও গবেষণা, তার নিদর্শনসমূহ অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে চোখ, কান ও অন্তর দান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান প্রভুর আনুগত্য। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, ﴿وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ‘তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৭৮)*। তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ‘বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর’ *(আল-মুলক, ৬৭/২৩)*।

মানুষের শ্রবণ (Human hearing) ও দর্শন অন্য যে কোনো প্রাণীর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কারণ, মানুষ শ্রবণশক্তি দ্বারা শরীআত ও রাসূলগণের দাওয়াত কবুল করে। এ শক্তির মাধ্যমে মানুষ এই মহাজগতের বিস্ময় সম্পর্কে শুনতে পারছে। এজন্য কানের গুরুত্ব, ব্যবহারবিধি, প্রয়োগস্থল এবং সৃষ্টিগত তাৎপর্য অনেক বেশি। আমাদের এই বস্তুগত জীবনে কান যে কত জরুরী অঙ্গ এবং কত মহামূল্যবান নেয়ামত, তা শুধু টের পাই তাদের দেখে, যারা এই অঙ্গের অভাবে বধির। আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে আরও বলেন, ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ﴾ ‘বলুন, কে রূযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক?’ *(ইউনুস, ১০/৩১)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ ‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩৬)*।

উল্লেখ্য, এসব আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে যেখানেই কুরআন মাজীদে শ্রবণ, দর্শন ও অন্তঃকরণের উল্লেখ হয়েছে, শ্রবণেন্দ্রিয়কে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি একটি জ্ঞাত বিষয় যে, মানুষের জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একজন শিশু অন্ধ হয়ে জন্ম নিলে তাকে অনেক বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু অল্প আয়াসেই সে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারে। পক্ষান্তরে, যে শিশু বধির হয়ে জন্ম নেয়, যে কোনো বস্তু সম্পর্কে জানতে তার অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।

কুরআন মাজীদ এভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ওপর শ্রবণেন্দ্রিয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। আরও উল্লেখ থাকে যে, ভ্রূণ শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয় গর্ভধারণের কেবল ২২ দিনের মধ্যেই এবং গর্ভধারণের চতুর্থ মাসে তা পুরোপুরি কাজ করতে শুরু করে। তখন ভ্রূণ মায়ের পাকস্থলীর গুড়গুড় শব্দ শুনতে পায় এবং সে শব্দও শুনতে পায় যা সে (মা) আহার ও পান করার সময় সৃষ্টি করে। এমন কি মায়ের চারপাশের শব্দও ভ্রূণটি শুনতে পায়। এভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয় এবং জীবনের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনেক আগেই একজন নবজাতকের মধ্যে তা কাজ করতে শুরু করে। কুরআন মাজীদ মানুষের অন্যান্য অঙ্গের পূর্বে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কথা উল্লেখ করার পিছনে এটিকে একটি কারণ বলা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতও এই বিষয়টিকে সমর্থন করে। **তাঁর সুন্নাত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, যখনই কোনো নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করে আমরা যেন তার কানে আযান শোনাই।**

এটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় যে, কুরআন মাজীদ শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে সর্বদা একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছে, পক্ষান্তরে দর্শনেন্দ্রিয়ের জন্যে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রেইনে যে ভিজুয়েল সেন্টার (দর্শনকেন্দ্র) রয়েছে যাকে Occipital lobe বলা হয়, তা দুইটি সমজাতীয় অংশে বিভক্ত। পক্ষান্তরে হিয়ারিং সেন্টার (শ্রবণকেন্দ্র) হচ্ছে একটি। কুরআন মাজীদের এ ধরনের সুনির্দিষ্ট শব্দচয়ন তার অন্য একটি মু'জেযা।

কান মাসাহ করা ও আধুনিক বিজ্ঞান :

কান মাসাহ করা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। কানের ভেতরের দিকে (পেট) ভিজা শাহাদাত আঙুল দ্বারা এবং বাইরের দিক (পিঠ) আঙুল দ্বারা মাসাহ করার মাধ্যমে কানের সকল প্রকারের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং এর দ্বারা শ্রুতির ওপর অন্তরঙ্গ প্রভাব পড়ে থাকে। যখন কানগুলো মাসাহ করা হয় তখন হৃদয়ের ওপর আশ্চর্য রকমের আনন্দের ছাপ পড়ে থাকে।

ফ্রান্সের গবেষকের মতে, মায়ের গর্ভে শব্দ শুনতে পায় শিশু। মানুষ জানত, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই শিশুর কান ফোটে। অর্থাৎ শুনতে পায়। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, জন্মের তিন মাস আগে থেকে শিশু মানুষের কথা শুনতে পায় এবং তা বুঝতেও পারে। আর এভাবে মাতৃগর্ভেই শিশুর বাকশক্তির বিকাশ ঘটে বলে ধারণা করছেন গবেষকরা। মাতৃগর্ভে থাকাকালে জন্মের তিন মাস আগে থেকেই শিশুরা মানুষের কথা শুনতে পায় এবং তা বুঝতেও পারে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের একদল গবেষক। সময়ের আগে জন্ম নেওয়া ১২টি নবজাতকের মস্তিষ্ক পরীক্ষায় এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানান তারা। গবেষণায় দেখা গেছে, মাতৃগর্ভে ২৮ সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার পরই শিশুরা 'গা' কিংবা 'বা' এর মতো ধ্বনি আলাদা করে বুঝতে পারে, এমনকি নারী পুরুষের কণ্ঠও আলাদা করে চিনতে পারে।

বাবা-মা'র কণ্ঠস্বর শুনে গর্ভাবস্থায়ই শিশুরা ভাষাদক্ষতা অর্জন করে বলে যে ধারণা রয়েছে তাই-ই আরও দৃঢ় হয়েছে নতুন এ গবেষণায়। শিশুরা গর্ভে থাকাকালে কোলাহল শুনতে পায়। এ বিষয়টি আগেও গবেষণা থেকে জেনেছেন বিশেষজ্ঞরা। শিশুর কান এবং শ্রবণেন্দ্রিয় গঠিত হয়ে যায় প্রায় ২৩ সপ্তাহ সময়েই। কিন্তু তারপরও মানবশিশু জন্মগতভাবেই বাকশক্তি নিয়ে জন্মায় নাকি জন্মের পর শব্দ শুনে বাকশক্তির বিকাশ ঘটে, তা নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়ে গেছে। প্রসেডিংস অব দ্যা ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস (পিএনএএস)-এ ফ্রান্সের গবেষকদের নতুন গবেষণা প্রতিবেদনে শিশুর ভাষা দক্ষতায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সন্দেহাতীতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গবেষকরা ধারণা করছেন, শিশুর এ দক্ষতা জন্মগত।

কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-২)

দলীল : ৪

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ ‘অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছেন। আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই তোমরা মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়, (এসময়) তোমরা (কাউকে) ভয় করবে না। তিনি জানেন যা তোমরা জানো না। এছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক আসন্ন বিজয়’ *(আল-ফাতহ, ৪৮/২৭)*।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় থাকা অবস্থায় একবার ছাহাবীগণকে তার স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি বায়তুল্লাহতে প্রবেশ করেছেন এবং তাওয়াফ করেছেন। পরবর্তীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে যখন তিনি মক্কা না গিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন, তখন কিছু ছাহাবীর অন্তরে আল্লাহর নবী ﷺ-এর উক্ত স্বপ্ন নিয়ে কিছুটা দ্বিধা-সংশয় কাজ করে। এমনকি উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি আমাদের এই সংবাদ দেননি যে, আমরা বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করব এবং তাওয়াফ করব?’ রাসূল ﷺ বলেন, ‘আমি কি বলেছি যে, তা এ বছরেই হবে?’ উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ‘না, সেটা তো বলেননি’। রাসূল ﷺ বলেন, ‘তোমরা অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং তাওয়াফ করবে’। মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য সত্যায়ন করেন। যা প্রমাণ করে পবিত্র কুরআনের বাহিরেও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকটে অহী আসত। সেটি স্বপ্নের মাধ্যমেও হতে পারে। সুতরাং কুরআনের বাহিরেও অহী আসার স্বীকৃতি পবিত্র কুরআন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

দলীল : ৫

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ - وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾

‘তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথম জমায়েতে তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণা করনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন জায়গা থেকে আসলো, যার আশা তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে নিজ হাতে এবং মুসলিমদের হাতে। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন নির্ধারণ না করতেন, তবে তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে (তার জানা উচিত যে,) আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। তোমরা যেসব খেজুরগাছ কর্তন করেছ আর যেসব গাছ সমূলে রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমেই করেছ এবং যাতে তিনি ফাসেক্বদের লাঞ্ছিত করতে পারেন’ *(আল-হাশর, ৫৯/২-৫)*।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন, তখন মদীনায় চির প্রতিদ্বন্দী আউস ও খাযরাজ গোত্র বসবাস করত। তাদের পাশাপাশি তিনটি ইয়াহূদী গোত্র বসবাস করত— বানূ নাযীর, বানূ কায়নুকা, বানূ কুরায়যা। আউস ও খাযরাজ গোত্রের প্রভাবশালী কিছু নেতা

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

ইসলাম গ্রহণ করলে এবং তারা রাসূল ﷺ-কে নেতা হিসেবে মেনে নিলে মদীনার ইয়াহূদীরাও রাসূল ﷺ-কে নেতা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তখন রাসূল ﷺ একটি সংবিধান তৈরি করেন মদীনা পরিচালনার জন্য। যার নাম 'মদীনা সনদ'। উক্ত সংবিধানের মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নেতা হন মুহাম্মাদ ﷺ। উক্ত সনদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল মদীনা নামক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং মদীনার নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু বানূ নাযীর গোত্র উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা মদীনা রাষ্ট্র ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ করে বসে। যদিও ইয়াহূদীশাস্ত্র মতে, বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড প্রদান করেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে অবরোধ করেন, কিন্তু তাদের দূর্গের পাশে খেজুর গাছের কারণে দূর্গ ভেদ করা যাচ্ছিল না। এজন্য রাসূল ﷺ খেজুর গাছ কর্তন করার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই কাজের জন্য মদীনায় অবস্থানরত অন্যান্য ইয়াহূদী গোত্র এবং কিছু মুনাফেক্ব সমালোচনা করা শুরু করে। মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতে তাদের উত্তরে অবতীর্ণ করেন। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বানূ নাযীরের যে খেজুরগাছ কেটে দিয়েছেন, তা তিনি নিজে থেকে করেননি; বরং আল্লাহর আদেশে করেছেন।

দলীলের যৌক্তিকতা : উক্ত আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বানূ নাযীরের সাথে যা করেছেন, তা পবিত্র কুরআনে কোথাও আদেশ করা হয়নি। বরং কুরআনের বাহিরে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে অহী করা হয়েছিল। সেই অহীর আদেশ অনুযায়ী তিনি সকল কিছু করেছেন। পরবর্তীতে মানুষ অভিযোগ উত্থাপন করলে আলাদাভাবে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি যা করেছেন তা আল্লাহর আদেশেই করেছেন। উক্ত আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকটে কুরআনের বাহিরেও অহী আসত। যার স্পষ্ট স্বীকৃতি উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ দিয়েছেন।

যে সমস্ত নবীর উপর কিতাব আসেনি এবং যারা শাসক ছিলেন না, তাঁদের উম্মতগণ হাদীছ অনুসরণ করতেন :

একদল মুনকিরে হাদীছ বলার চেষ্টা করে, আমাদের নবী ﷺ শাসক ছিলেন, তাই ছাহাবীগণ শাসক হিসেবে তাঁর কথা অনুসরণ করতেন; তাঁর হাদীছের নয়। আমরা উত্তরে বলতে চাই, পৃথিবীতে বহু নবী এমন এসেছেন, যারা শাসন ক্ষমতা অর্জন করতে পারেননি; এমনকি তারা কিতাবও পাননি, তাহলে তাদের উম্মাতগণ কীসের অনুসরণ করতেন? তারা মূলত পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও হাদীছ অনুসরণ করতেন। সেক্ষেত্রে সেই উম্মতের বিভিন্ন জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্ন, সমস্যা প্রভৃতির সমাধান আল্লাহ কর্তৃক অহীর মাধ্যমে দিতেন। মূসা আলাইহিস সালাম-এর পরে বানূ ইসরাঈলের নবীদেরকে আলাদা কোনো কিতাব দেওয়া হয়নি। বরং পরবর্তী সকল নবীই উক্ত তাওরাতের ব্যাখ্যাকার হিসেবে প্রেরিত হতেন। আর কিতাবের বাহিরে নবীদের নিকট যা অহী করা হয়, তাকেই হাদীছ বলা হয়। মহান আল্লাহও পবিত্র কুরআনে হাদীছ বলে সম্বোধন করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى - إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ 'আপনার নিকট কি মূসার হাদীছ (বৃত্তান্ত) পৌঁছেছে? যখন তাকে তাঁর প্রতিপালক পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় ডাক দিয়েছিলেন' *(আন-নাযিআত, ৭৯/১৫-১৬)*।

দলীলের যৌক্তিকতা : মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে পবিত্র উপত্যকায় যা ঘটেছে তা তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার আগেই ঘটেছে। সুতরাং তার স্বাভাবিক জীবনের এই ঘটনা অবশ্যই হাদীছ। তাই মহান আল্লাহ এই ঘটনাকে হাদীছ হিসেবে সম্বোধন করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ - إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ 'আপনার নিকট কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের হাদীছ (বৃত্তান্ত) পৌঁছেছে? যখন তাঁরা তাঁর কাছে প্রবেশ করেন অতঃপর বলেন, 'সালাম' (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)! আর তিনিও উত্তরে বললেন, 'সালাম' (আপনাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক)। (আপনারা তো) অপরিচিত লোক (অর্থাৎ আমি তো আপনাদের চিনতে পারছি না)!' *(আয-যারিয়াত, ৫১/২৪-২৫)*।

দলীলের যৌক্তিকতা : উক্ত ঘটনাটি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ ছহীফার অংশ নয়, বরং তার স্বাভাবিক জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা। যা অবশ্যই হাদীছ।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا - وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ‘নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি অহী করেছি, যেভাবে আমি অহী করেছিলাম নূহের প্রতি এবং তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি। আর আমি আরো অহী করেছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দিয়েছি যাবূর। (আর আমি পাঠিয়েছি) এমন অনেক রাসূল, যাদের বৃত্তান্ত আমি ইতোপূর্বে আপনার কাছে বর্ণনা করেছি, এবং (আমি আরো পাঠিয়েছি) এমন অনেক রাসূল, যাদের বৃত্তান্ত আমি আপনার কাছে বর্ণনা করিনি। আর আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন’ *(আন-নিসা, ৪/১৬৩-১৬৪)*।

দলীলের যৌক্তিকতা : উক্ত আয়াতে উল্লিখিত অধিকাংশ নবীকেই মহান আল্লাহ রাষ্ট্রক্ষমতা এবং কিতাব প্রদান করেননি। যেমন ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, ইউনুস ও হারূন। তাহলে তাঁদের কাছে আল্লাহ তাআলা কিতাব ছাড়াই অহী প্রেরণ করতেন। আর এই অহীকেই হাদীছ বলা হয়।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আদর্শ মূলত তার হাদীছ :

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ‘তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করছি। আর তোমাদের ও আমাদের মাঝে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছো, তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর বাবার উদ্দেশ্যে তাঁর এই কথা ব্যতীত, (তিনি বলেছিলেন), ‘আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তবে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে আমি কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখি না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল’ *(আল-মুমতাহিনা, ৬০/৪)*।

দলীলের যৌক্তিকতা : মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মাঝে আদর্শ থাকার কথা বলেছেন আর তাঁর আদর্শের কথা তিনি পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর যে আদর্শগুলো মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, তা মূলত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্বাভাবিক জীবনী যা তাঁর জীবনে ঘটেছে; যা তার স্ত্রীর সাথে ঘটেছে; যা তাঁর সন্তানদের সাথে ঘটেছে; সেটাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তথা একজন নবীর স্বাভাবিক জীবনীও মানুষের জন্য আদর্শ। তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে যা কিছু করেন সেটাও অহীর নির্দেশনা মাফিক হয়ে থাকে, যা অনেক সময় কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

আমরা উদাহরণ হিসেবে পেশ করলে দেখতে পাব, ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ছোটবেলার ঘটনাগুলো অবশ্যই তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব ছিল না, বরং তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। তেমনি মূসা আলাইহিস সালাম-এর ছোটবেলার ঘটনাগুলো তাঁর উপর প্রেরিত কিতাব ছিল না; তিনি কিতাব পেয়েছেন অনেক পরে। এভাবে আমাদের নবী পর্যন্ত সকল নবীর স্বাভাবিক জীবনী আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় হিসেবেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কেননা এগুলো সবই মহান আল্লাহ তাঁদের অন্তরে ইলহাম, স্বপ্ন ও সরাসরি ফেরেশতা পাঠানোর মাধ্যমে অহী করে থাকেন। আর এই অহীকেই হাদীছ বলা হয়। সুতরাং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আদর্শ মানে তাঁর হাদীছের অনুসরণ। তাঁর স্বাভাবিক জীবনের ঘটনাবলির অনুসরণ। তেমনি আমাদের নবীর আদর্শ অনুসরণ মানে তার স্বাভাবিক জীবনের ঘটনাবলির অনুসরণ যা পবিত্র কুরআনে অহী আকারে অবতীর্ণ হয়নি। আর অনুসরণীয় আদর্শ কখনো বইয়ের পাতা থেকে পাওয়া যায় না; বাস্তব চরিত্র থেকে অনুসরণীয় আদর্শ পাওয়া যায়। মহান আল্লাহর নির্দেশাবলি কিতাবে সন্নিবেশিত থাকে আর বাস্তব চরিত্র হিসেবে তিনি নবীদের প্রেরণ করে থাকেন, যারা সেই কিতাবের আলোকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া অহীর মাধ্যমে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে থাকেন।

(চলবে)

কিশোর গ্যাং : কারণ, ধরন ও প্রতিকার

-মো. হাসিম আলী*

শৈশব ও বাল্য পেরিয়ে সংক্ষিপ্ত বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর যে দ্রুত, বাড়ন্ত ও পরিবর্তনশীল সময় তাকে কৈশোর বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)- এর মতে, ১০ বছর ও ১৯ বছর বয়সের মাঝামাঝি সময়টাকে কৈশোর বলে। সে মতে কিশোর-কিশোরী হলো ১০ বছর ও ১৯ বছর বয়সের মাঝামাঝি বয়সী ছেলে-মেয়ে। আর গ্যাং অর্থ দল। নির্দিষ্ট কিছু লোকের একটা দলকে গ্যাং বলে। গ্যাং শব্দটি সাধারণত অপরাধ বা নেতিবাচক কাজে জড়িত কোনো দল বা গ্রুপ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। অপরাধের সাথে জড়িত কিশোরদের প্রত্যেকটি দলকে কিশোর গ্যাং বলে।

কৈশোর মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। এসময়েই রচিত হয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু কিশোররা যখন বিপথগামী হয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন সেই অমিত সম্ভাবনাময় কিশোরটিই পরিণত হয় দেশ ও জাতির মহা আপদে। বর্তমানে কিশোর গ্যাং একটি ভয়ানক সামাজিক ব্যাধি ও মহা বিষফোড়ার নাম। প্রথম দিকে কিশোর গ্যাং কালচার রাজধানী ও বড় বড় বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সারা দেশে ভয়াবহভাবে বাড়ছে কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার। শহর, নগর ও গ্রাম সর্বত্রই সমান তালে গ্যাং কালচারের আধিপত্য। প্রতিটি জনপদেই তারা সাধারণ মানুষের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর লেখাপড়া না জানা ভবঘুরে কিশোর থেকে শুরু করে অভিজাত ঘরের কিশোররাও জড়িয়ে পড়ছে এ অভিশপ্ত কালচারে। বিশেষ করে রাজধানীর বড় শহরগুলোর অলিগলিতে কিশোর গ্যাং এখন মূর্তিমান আতঙ্ক। প্রতিদিনই তারা কোনো না কোনো অপরাধের কারণে পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে। কিশোর গ্যাং কালচার শুরুতে আড্ডা কিংবা ইভটিজিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তা এখন ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদকব্যবসা, ভাঙচুর, দখলদারিত্ব, আধিপত্য বিস্তার এমনকি খুনখারাবি পর্যন্ত গড়িয়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউই নিরাপদ নয় তাদের কাছে। মোটকথা, কিশোর গ্যাংয়ের কর্মকাণ্ডে জনজীবন রীতিমতো অতিষ্ঠ, শঙ্কিত ও আতঙ্কিত। কিশোর গ্যাং নামে মানুষ শকুনদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে এখনই কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। অন্যথা এ অপরিণামদর্শী গ্যাং সদস্যরাই বাংলাদেশের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানতে পারে।

কিশোর গ্যাংয়ের কারণ :

কিশোর গ্যাং একদিনে কিংবা একক কোনো কারণে সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও বহুমুখী কারণ। সুশীল সমাজ, সমাজবিজ্ঞানী, অপরাধ বিশ্লেষক, আইন বিশেষজ্ঞ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সচেতন নাগরিক সমাজ কিশোর গ্যাংয়ের উৎপত্তি ও কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। যেমন—

(১) বড়ভাই-ছোটভাই কালচার : মানব সমাজে বয়সের ভিত্তিতে কেউ ছোট কেউ বড়। এই বড় ও ছোটদের সম্পর্কের ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্মান-শ্রদ্ধা, স্নেহ-ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতা। এ ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে মানব সমাজ ও সভ্যতা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অধুনা আমাদের সমাজে 'বড়ভাই' ও 'ছোটভাই' কালচার গড়ে উঠেছে। এ কালচারের ভিত্তি হলো অন্যায় আশ্রয়-প্রশ্রয় ও অবৈধ স্বার্থসিদ্ধি যা কিশোর গ্যাংয়ের অন্যতম কারণ।

(২) সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব : আদর্শিক ভিত্তি ছাড়া নিছক পার্থিব স্বার্থের উপর কোনো সম্পর্ক টেকসই হয় না। স্বার্থে সামান্য আঘাত আসলেই কিংবা সামান্য মনোমালিন্য হলেই কথিত বড়ভাই ও ছোটভাইয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরে। শুরু হয় ছোট-বড় তথা সিনিয়র-জুনিয়রের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বই পরিণামে আরেকটি কিশোর গ্যাংয়ের জন্ম দেয়।[১]

(৩) বুড়ো গ্যাং : ছোটরা অনুকরণ প্রিয়। তারা বড়দের থেকে শেখে। আমাদের সমাজে বড়রা গ্যাং কালচারের সাথে জড়িত। নামে-বেনামে তাদের অনেক গ্যাং আছে। বড়দের এসব গ্যাং কালচার দ্বারা তাদের ছোট অর্থাৎ কিশোররা প্রভাবিত হয়। এক পর্যায়ে তারাও গ্যাং কালচারে জড়িয়ে পড়ে। কিশোর গ্যাংয়ের পেছনে আসল গডফাদার হিসেবে রয়েছে এই 'বুড়ো গ্যাং'। এরা নিজেরা কিশোর না হলেও কিশোরদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলে নানা অপকর্ম করায়। মূলত তাদের কারণে কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না। আইনি বা অন্য কোনো ঝক্কি-ঝামেলা থেকে গ্যাং সদস্যদের রক্ষা করেন। রাজনৈতিক দলের মিটিং-মিছিলে লোক জোগান দেওয়াসহ

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

১. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল, ২০২৩।

এলাকায় দলীয় আধিপত্য বিস্তারে 'কিশোর গ্যাং'-কে ব্যবহার করে এই 'বুড়ো গ্যাং'। 'বড়ভাই' হিসেবে পরিচিত এসব 'বুড়ো গ্যাং'-এর দৌরাত্ম্য বন্ধ না হলে কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যও বন্ধ হবে না। এসব বুড়ো গ্যাংয়ের মধ্যে ঢাকার সোহেল রানা গ্যাং বহুবার পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে।[২]

(৪) সামাজিক অসঙ্গতি : সামাজিক অসঙ্গতি মানুষের মনে ক্ষোভ ও দ্রোহ তৈরি করে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সমাজিক অসঙ্গতি ক্রমে বেড়েই চলেছে। এর অনিবার্য ফল হিসেবে জন্ম নিচ্ছে কিশোর গ্যাং।

(৫) ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রভাব : প্রত্যেক সমাজের মানুষ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত। আমরা ধীরে ধীরে নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, ভিনদেশি সংস্কৃতি আমদানি করতে নিজেরা রীতিমতো প্রতিযোগিতা করছি। ফলে শিশু-কিশোররাও ভিনদেশিদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে। এক পর্যায়ে ভিনদেশি সংস্কৃতি ইচ্ছামতো তাদের আয়ত্তে চলে যাওয়ায় তাদের আচরণেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

(৬) হিরোইজম বা বীরত্ব প্রদর্শন : হিরোইজম বা বীরত্ব প্রদর্শন কিশোরদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তারা স্বাধীনভাবে বলতে চায়, স্বাধীনভাবে চলতে চায়, ভিন্ন কিছু করে দেখাতে চায়, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে চায়। এটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এ চাওয়াটাই যখন বাস্তবতা বর্জিত এবং শুধু আবেগ নির্ভর হয়ে পড়ে, তখন তা উচ্ছৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়। আবেগতাড়িত ও উচ্ছৃঙ্খল হিরোইজমই কিশোর গ্যাংয়ের অন্যতম কারণ।

(৭) অপরাধনির্ভর দেশি-বিদেশি সিনেমা : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রচলিত নাটক-সিনেমায় দায়বদ্ধতার জায়গাটি খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেখানে স্থান পেয়েছে অবাধ্যতা, অশ্লীলতা, অস্ত্রবাজি, ছিনতাই, অপহরণ, ইভটিজিং, শঠতা, প্রতারণা, মাদকতা, নারীর বস্ত্রহরণ, খুনখারাবি এবং যৌনসুড়সুড়ি নির্ভর রগরগে দৃশ্য। এগুলো দর্শকদের অপরাধপ্রবণতাই বৃদ্ধি করছে। তারা নায়ক-নায়িকাদের অনুকরণে হিরো সাজার জন্য অপরাধ সংঘটনের প্রেরণা পাচ্ছে। সুতরাং প্রচলিত নাটক-সিনেমাও কিশোর গ্যাং তৈরির জন্য দায়ী।

(৮) সঠিক ও সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের অভাব : সামাজিকীকরণ মানুষের জীবনব্যাপী একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ জীবনের কাঙ্ক্ষিত আচরণ উপযোগী হয়ে গড়ে উঠে। শিশু একটি পরিবারে তথা সমাজে যেভাবে সামাজিক হয়ে ওঠে তাকে সামাজিকীকরণ বলা হয়। সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান বাহন পরিবার। এছাড়া স্থানীয় সমাজ, স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান, সমবয়সী সঙ্গী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক ও সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের অভাবে কিশোররা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে এবং কিশোর গ্যাং অপ্রতিরোধ্য গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৯) ব্যর্থ প্যারেন্টিং : প্যারেন্টিং অর্থ সন্তান প্রতিপালন। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সন্তান জন্মের পর থেকে তার অগ্রগতির প্রতি সজাগ থাকা হয় এবং মানসিক, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইত্যাদি দিক দিয়ে তাকে সহযোগিতা করা হয়। এককথায়, সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্যই প্যারেন্টিং। প্যারেন্টিং একটি 'গোল্ডেন জব', মহান ব্রত। এতে আছে প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, লক্ষ্য নির্ধারণ, প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও প্রতিফলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের দেশের অধিকাংশ পিতা-মাতা প্যারেন্টিং সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা প্যারেন্টিং বলতে সন্তান জন্মদান ও সনাতনী পদ্ধতিতে তাদের বেড়ে উঠাকে বুঝে থাকেন। সন্তান কোথায় যাচ্ছে? কী করছে? কার সাথে মিশছে?— এব্যাপারে অধিকাংশ পিতা-মাতা খোঁজই নেন না। এ প্যারেন্টিং ব্যর্থতা কিশোর গ্যাংয়ের অন্যতম কারণ।

(১০) আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সীমাবদ্ধতা, শৈথিল্য ও দলীয় লেজুড়বৃত্তি : যে কোনো অপরাধ দমনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট বলে অভিজ্ঞরা মনে করেন। তারা যদি যথাযথভাবে আইন প্রয়োগ করেন, তাহলে কিশোর গ্যাং তো দূরের কথা, ভয়ংকর যে কোনো অপরাধ নির্মূল করাও সময়ের ব্যাপার মাত্র। অথচ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কিশোর অপরাধ দমনে পুলিশের উদ্যোগ প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে শুধু তালিকা করেই দায় সারছে পুলিশ। পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে বলছেন, তালিকা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। রাজনৈতিক কারণেও অনেক এলাকায় কিশোর অপরাধীদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে বেগ পেতে হয়। অনেক সময় পুলিশ আইন প্রয়োগ করতে গেলেই আসছে রাজনৈতিক নেতা তথা বড় ভাইদের থেকে

২. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল, ২০২৩।

অদৃশ্য বাধা।[৩] সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি দলীয় লেজুড়বৃত্তির অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে। ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা ও পরিচালিত কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের সমীহ করে চলেন অনেক পুলিশ কর্মকর্তা। অনেক ক্ষেত্রে বখাটে কিশোর গ্যাং সদস্যদের নির্দেশ মতো নিরীহ ও নিরপরাধ কিশোরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করার অভিযোগও ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। তাছাড়া, পুলিশের সোর্স হিসেবে যাদের ব্যবহার করে তারাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপরাধীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যা অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

(১১) দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তাছাড়া অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পথশিশুর সংখ্যা ১৩ লাখের বেশি। পুলিশের তথ্য মতে, ১১ লাখ পথশিশু কোনো না কোনো অপরাধের সাথে জড়িত। পথশিশুদের ৮৫ শতাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাদকে আসক্ত। তাছাড়া তারা রাজনৈতিক মিছিল-মিটিং, শোডাউন, পিকেটিং, ভাঙচুরসহ নানা অপরাধে ব্যবহার হচ্ছে।[৪] বিশেষজ্ঞদের মতে, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে অনেকে গ্যাং কালচারের দিকে ধাবিত হয়।

(১২) শিশুর বয়স নির্ধারণ ও আইনের ফাঁকফোকর : কিশোর গ্যাং সদস্যদের অধিকাংশের বয়স ১৩ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০-১১-১৯৮৯ কনভেনশন অব দ্য রাইট অব দ্য চাইল্ড সম্মেলনে শিশুর বয়স ১৮ নির্ধারণ করা হয়। সে আলোকে শিশু আইন-২০১৩ আইনে শিশুর বয়স ১৮ বছর নির্ধারিত হয়েছে। শিশু আইন-১৯৭৪ এ শিশুর বয়স নির্ধারিত ছিল ১৬ বছর। বাংলাদেশের পেনাল কোডের-৮২ ধারা মোতাবেক ৭ বছরের নিচে কোনো শিশুর আইনবহির্ভূত ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। ঐ আইনে ৮৩ ধারা মোতাবেক বিচারকের দৃষ্টিতে ১২ বছরের কোনো শিশুর যদি ম্যাচুরিটি সনাক্ত না হয় সে ক্ষেত্রেও শিশুটি অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে না। ডিজিটাল যুগে ১৬-১৮ বছরের একজন কিশোর যথেষ্ট ম্যাচুরিটি লাভ করে। অথচ এরা যত বড় অপরাধই করুক না কেন তাদের শিশু আইনে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে। ওই আইনে হত্যাকাণ্ডের মতো গুরুতর অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর। ফলে তারা নানা অপরাধমূলক কাজ করেও আইনের সুবিধা ভোগ করছে।[৫]

(১৩) মাদকের সহজলভ্যতা : মাদক এখন খুবই সহজলভ্য। হাত বাড়ালেই তা পাওয়া যায়। মাদক সেবনের টাকার জন্য অনেকেই কিশোর গ্যাংয়ে যোগ দেয়।[৬] 'অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২' এটিকে আরও সহজ করে দিয়েছে। এই নতুন বিধিমালার আলোকে ২১ বছরের বেশি বয়সীরা মদ খাওয়ার অনুমতি পাবে। এ বিধিমালার আলোকে কোনো এলাকায় ১০০ জন দেশি বা বিদেশি মদের পারমিটধারী থাকলে ওই এলাকায় অ্যালকোহল বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া যাবে।[৭]

(১৪) পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় : একজন শিশুর প্রথম পাঠশালা তার পরিবার। বাবা-মা প্রথম শিক্ষক। যখন কোনো পরিবারে বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন থেকে তারা পরিবারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে কিশোর গ্যাংয়ে পরিণত হয়। অপরাধ ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, যে বয়সে কিশোররা স্কুল-কলেজে থাকার কথা তখন তারা নেশায় বুদ হয়ে থাকে। এমন কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নেই যার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা নেই। মূলত পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই কিশোররা আজ বিপথগামী। যখন তাদের হাতে থাকার কথা কলম, তখন থাকছে অস্ত্র। এই পরিস্থিতির দায় পরিবার ও সমাজের। কারণ পরিবার সেই নৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারেনি। আর সমাজের গুটিকয়েক লোক কিশোরদের ব্যবহার করছে। তাদের ছত্রছায়ায় কিশোররা অপরাধী হয়ে উঠছে।

(১৫) খেলাধুলা ও সাংস্কৃতির কর্মকাণ্ডের সঙ্কোচন : শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলার মাঠ অগ্রণী ভূমিকা রাখে। শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের পরেই বেশি অবদান রাখে খেলার মাঠের সঙ্গী-সাথীরা। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে কংক্রিটের স্তূপে চাপা পড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে শিশুর স্বাভাবিক জীবন। ঘরবন্দি শিশুর দৌড়ে বেড়ানোর, খেলার সেই মাঠই নেই। মেগাসিটি ঢাকায় জনসংখ্যার অনুপাতে অন্তত ১ হাজার ৩০০টি খেলার

৩. দৈনিক যুগান্তর, ১৩ মে, ২০২৩।
৪. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২ মার্চ, ২০২২।
৫. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৮ অক্টোবর, ২০২২; দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ২২ জানুয়ারি, ২০২৩।
৬. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২২ নভেম্বর, ২০২২।
৭. সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৪ মার্চ, ২০২২।

মাঠ প্রয়োজন। অথচ ঢাকায় খেলার মাঠের সংখ্যা মাত্র ২৩৫টি। আবার ঢাকার প্রায় ৯৫ শতাংশ স্কুলে কোনো খেলার মাঠ নেই। শহরাঞ্চল তো বটেই গ্রামেও শিশু-কিশোরদের জন্য উন্মুক্ত খেলার মাঠ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। পরিকল্পিত এবং অপরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে খেলার মাঠ ধ্বংসের মাধ্যমে ধ্বংস হচ্ছে আগামীর সম্ভাবনাময় প্রজন্ম। ফলে শিশু-কিশোরদের সুস্থ-স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সুষ্ঠু বিনোদন ব্যবস্থার অভাবে আজকের শিশু-কিশোরদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে গ্যাং কালচার, বাড়ছে হানাহানি, মারামারি।[৮]

(১৬) বই পড়ার অভ্যাস ত্যাগ : বই জ্ঞানের ধারক। বই জ্ঞানের আলো। বইয়ের সাথে শরীরের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। বই শরীরকে সুস্থ রাখে। বই মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ফোকাস পাওয়ার বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, মানসিক ভারসাম্য তৈরি করে। বই পড়ার সময় মস্তিষ্ক সবচেয়ে অ্যাক্টিভ থাকে। শরীরের পেশিগুলোকে সচল করতে যেমন ব্যায়ামের বিকল্প নেই, বই পড়া হলো মস্তিষ্কের ব্যায়াম।[৯] কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য, এদেশের শিক্ষার্থীরা দারুণভাবে বইবিমুখ। কুরআন, হাদীছ, ধর্মীয় বই, গল্প, কবিতা, সাহিত্যের বই দূরে থাক তারা নিজের পাঠ্যবইও ঠিকমতো অধ্যয়ন করে না। এই বইবিমুখতা কিশোর গ্যাংয়ের অন্যতম কারণ।

(১৭) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন : রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশ পরিচালনার নীতি-নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অপরাধপ্রবণ ও বিপথগামী হয়, তখন ঐ জাতির পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিশোর গ্যাং সৃষ্টি, প্রতিপালন ও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংশ্লিষ্টতার কথা সকল আলোচনা ও গবেষণায় উঠে এসেছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা উঠতি বয়সী ও বেপরোয়া এসব কিশোরদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়েদা নিয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতারাই মূলত এসব গ্যাং পরিচালনা করে থাকেন। এর জন্য তারা প্রথমে বেপরোয়া কিশোরদের বিভিন্নভাবে একত্রিত করেন। এরপর নিজেকে 'বড় ভাই' হিসেবে দেখিয়ে তাদের জড়িয়ে দেন বিভিন্ন অপরাধে। পরে সেই অপরাধ থেকে নিজেই তাদের উদ্ধার করে বনে যান দয়ার অবতার ও ত্রাণকর্তা। এরপর নিজের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তাদের দিয়ে গড়ে তোলেন গ্যাং। রাজনৈতিক মিছিল মিটিং থেকে শুরু করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজেও তাদের ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় মূলত কিশোর গ্যাং প্রতিপালিত হয়ে থাকে।[১০]

(১৮) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক জাতি গড়ার মহান কারিগর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতির প্রশিক্ষণালয়। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি তো দূরে থাক নিজের অস্তিত্বও রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা করুণ। শিক্ষকের হাতে বই এর পরিবর্তে ফেসবুক। শিক্ষার্থীর হাতে বই, কলমের পরিবর্তে মারণাস্ত্র। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন মানুষ গড়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থী তৈরিতে ব্যস্ত। এগুলো এখন টাকা উপার্জন এবং সনদ তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। মানুষ তৈরির মহান কারিগররাও 'শিক্ষা শ্রমিক'-এ পরিণত হয়েছেন। তারা পেটের দায়ে ছাত্র-অভিভাবক ও প্রশাসনের সব অনৈতিকতাকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রশ্রয় দিচ্ছেন অথবা নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। কারণ ন্যূনতম নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে গেলে তাদেরকে নানামুখী হয়রানি এমনকি খুনেরও শিকার হতে হচ্ছে। সেই সাথে কিছু শিক্ষকের নৈতিক স্খলন তো আছেই। এই ক্রমাবনতির জন্য রাষ্ট্রীয় নানা অনুশাসনও কম দায়ী নয়। মোটকথা, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শ জাতি গঠন এবং জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতিতে অবদান রাখতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। এ ব্যর্থতা কিশোর গ্যাং তৈরির অন্যতম কারণ।

(১৯) পরীক্ষায় সহজে পাশের ব্যবস্থা : পরীক্ষা মূল্যায়নের একটি মাধ্যম। এখানে পাশ ফেল থাকা বৈচিত্র নয়। যারা পরিশ্রম করবে, অধ্যবসায় করবে তারা ভালো ফলাফল করবে। যারা অমনোযোগী হবে কিংবা শ্রমবিমুখ হবে তারা ফেল করবে। পরবর্তীতে আবার চেষ্টা করবে পাশ করার—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা প্রসাশনের সাথে যুক্ত কর্তা ব্যক্তিদের আচরণে মনে হয় তারা সবাই 'ফেল' শব্দটি তুলে দেওয়ার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন। শ্রেণিকক্ষে বিষয় শিক্ষককে, পরীক্ষার হলে কক্ষ পরিদর্শককে, বোর্ড থেকে খাতা বিতরণের সময় পরীক্ষককে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে 'চেক এন্ড ব্যালেন্স'-এর নামে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যথাযথ দায়িত্ব পালনের সম্ভাব্য পরিণতি। বুদ্ধিমান শিক্ষক তাই ফেল করানোর ঝুঁকি তো নিচ্ছেনই না; বরং পাশ দেখাতে যা যা করণীয় তার সবটিই করছেন। তাই

৮. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

৯. দৈনিক যুগান্তর, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

১০. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল, ২০২৩।

নিজ প্রতিষ্ঠানে সারা জীবন ফেল করা ছাত্রটিও নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং বোর্ড পরীক্ষায় প্লাস পেয়ে শিক্ষকের সামনে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে সাহস পায়। পরীক্ষার হলে বিষয়ের নাম লিখতে না পারা ছাত্রটি যখন ভালো ফলাফলের নিশ্চয়তা পায় তখন শিক্ষার মান নিয়ে কথা বলা নিতান্তই বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। এভাবে পরীক্ষায় সহজ পাশ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে পড়ার টেবিল থেকে নিয়ে যাচ্ছে কিশোর গ্যাংয়ের অন্ধকার জগতে।

(২০) মানবিক আচরণ এবং কাউন্সিলিংয়ের অভাব : মানবিক আচরণ মানুষকে সংশোধন হতে সাহায্য করে। আমাদের দেশে যখন কোনো কিশোর বিপথে যায়, খারাপ সঙ্গে মিশে, অপরাধপ্রবণতায় লিপ্ত হয়, তখন তাদেরকে সবাই বাঁকা চোখে দেখে, এড়িয়ে চলে কিংবা সমালোচনা করে। এসব বিপথগামীদের হৃদয়ের কান্না শোনা, তাদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা, কারণ উদ্ঘাটন করা এবং উত্তরণের পথনির্দেশ করার লোক নেই বললেই চলে। এই বাঁকা চোখে দেখা এবং এড়িয়ে চলা তাদের আরো বড় অপরাধী হতে উদ্বুদ্ধ করে। অথচ এই কিশোরদের প্রতি একটু মানবিক আচরণই তাদেরকে সুপথে দিশা দিতে পারে।

(২১) নৈতিক শিক্ষার অভাব : নীতি সম্বন্ধীয় শিক্ষাই নৈতিক শিক্ষা। শিশু-কিশোররা সাধারণত পিতা-মাতা, বাড়ির বয়স্ক সদস্য, প্রতিবেশী, শিক্ষক, সহপাঠী, সঙ্গীদের কাছ থেকে নৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয় এমন উচ্চতায়(!) পৌঁছেছে যে, শিশু-কিশোরদের সামনে আদর্শিক কোনো মডেল নেই। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই তারা অনৈতিকতার পথে পা বাড়াচ্ছে। এছাড়া, নৈতিক শিক্ষার ভাণ্ডার হলো কুরআন ও হাদীছ। কিন্তু আমাদের দেশে পরিবার, বিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চরমভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষাকে। নৈতিক শিক্ষার অভাবে কোমলমতি কিশোররা গ্যাং কালচারে জড়িয়ে পড়ছে।

কিশোর গ্যাংয়ের ধরন ও কার্যক্রম :

বাংলাদেশে কিশোর গ্যাং নামক সন্ত্রাসী সংস্কৃতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় ২০১২ সালে। ২০১৭ সালে উত্তরার ট্রাস্ট কলেজের ৮ম শ্রেণির ছাত্র আদনান কবির খুনের পর এদের কর্মকাণ্ড আলোচনায় আসে। প্রথমে এদের কর্মকাণ্ড দলবেঁধে আড্ডাবাজি ও ইভটিজিং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আস্তে আস্তে তাদের অপরাধজগৎ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সংশ্লিষ্টসূত্রগুলো বলছে, ১০ বছর বয়স থেকে শুরু করে ২০ বছর বয়সীরা কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য। তাদের অধিকাংশের বয়স ১৩ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। প্রতিটি গ্যাংয়ের আলাদা আলাদা নাম থাকে। প্রতিটি গ্যাংয়ে ১০ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত সদস্য থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু গ্যাংয়ের সদস্যদের চলাফেরা, চুলের কাটিং, পোশাক একই ধরনের থাকে। ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে তাদের গ্রুপ খোলা থাকে। এসব গ্রুপের মাধ্যমেই তথ্য আদানপ্রদান করা হয়। একেকটি গ্যাংয়ের একজন দলনেতা থাকে। মূলত তার নেতৃত্বেই গ্যাং পরিচালিত হয়। আবার তাদের একজন পৃষ্ঠপোষক থাকে।

কিশোর গ্যাংয়ের অধিকাংশ স্কুলপড়ুয়া ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী। তারা অধিকাংশ সময় দলবেঁধে চলে, দলবেঁধে আড্ডাবাজি করে। তারা দলবেঁধে দ্রুতবেগে মোটরসাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তারা স্কুল-কলেজ শুরু ও ছুটির সময় ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত (ইভটিজিং) করে এবং বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়। তারা নারীদের ফেসবুক মেসেঞ্জারে আপত্তিকর ছবি পাঠায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীল ভিডিও শেয়ার করে, প্রকাশ্যে ধূমপান করে, যত্রতত্র মাদকদ্রব্য সেবন করে। তারা অকারণে মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মারামারিতে লিপ্ত হয়। আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। চুক্তিতে মারামারি করে। ফুটপাত, বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ও নতুন ভবন তৈরির সময় ভবন মালিকদের থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে। মহল্লায় নতুন ভাড়াটিয়া দেখলেই বিভিন্ন কৌশলে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি বাসার ভেতরে গিয়ে হেনস্তা করে (তাদের ভাষায় ভিটিং দেওয়া)। পরীক্ষার সময় বিশেষ করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় এদের দৌরাত্ম্য খুব বেশি দেখা যায়। ধর্মীয় উৎসব যেমন— ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, দুর্গাপূজার সময় কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য থাকে চোখে পড়ার মতো। বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেও তারা বেপরোয়া আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। তারা মাদকবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। যত্রতত্র হামলা ও ভাঙচুর চালায়, স্কুল-কলেজে বুলিং-র‍্যাগিং তাদের নিত্যকর্ম। কথায় কথায় তারা দেশীয় ও খুদে অস্ত্র প্রদর্শন করে। জবরদখল, হাঙ্গামা, জমি দখল, ছিনতাই, মাস্তানি, অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, বোমাবাজি, অপহরণ, খুনখারাবিসহ নানা অপরাধে তারা জড়িত হচ্ছে। কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা কী ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে তা মাত্র কয়েকটি রির্পোট দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করা ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া

[৯ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ২৭ জুন, ২০২৩। আরাফার মাঠে অবস্থিত 'মসজিদে নামিরা'ই আরাফার খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান দাতা। যিনি আমাদের জামাআতবদ্ধ জীবনযাপনকে নাজাত এবং বিভক্ত হয়ে থাকাকে আযাবের কারণ করেছেন; যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে দলবদ্ধ জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মতানৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিকারী সকল বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমরা যার কাছে আশা রাখি, যাকে ভালোবাসি এবং যার অসন্তুষ্টি ও আযাব থেকে আমরা ভয় পাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু' *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৩)*। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। যিনি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিতভাবে সমাজবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পারস্পরিক সংঘাত ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিষেধ করেছেন। ফলে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা হৃদয়সমূহকে একত্রিত করেছেন এবং তাঁর দ্বারা অবস্থাসমূহ সংশোধন করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে রিসালাতের পয়গাম পৌঁছাতে এবং আমানত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলো, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, (সেই আল্লাহর) যিনি আকাশসমূহ আর পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৫৮)*। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবীগণ ও তাঁর অনুসারীগণের উপরে রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর শরীআতের পূর্ণ অনুসরণ ও তাঁর সীমারেখা রক্ষার মাধ্যমে আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। যাতে আপনারা দুনিয়া ও আখেরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ও বিজয়ী হতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা' *(আন-নিসা, ৪/১৩)*। আল্লাহর সীমারেখার হেফাযতের বিষয়সমূহের অন্যতম হলো, গায়রুল্লাহর জন্য কোনো ইবাদাত না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না'। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না' *(ইউসুফ, ১২/৪০)*। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদের অনুসারী, সেই কেবল হেদায়াতের অনুসারী। তার জন্যই রয়েছে নাজাত এবং প্রশংসনীয় পরিণাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদাত করো আর ত্বাগূতকে বর্জন করো। অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের উপর অবধারিত হয়েছে গোমরাহি, অতএব যমীনে ভ্রমণ করে দেখো, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী ঘটেছিল!' *(আন-নাহল, ১৬/৩৬)*।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই। তাওহীদের এই সাক্ষ্যের নির্দেশ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডেকো না, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর চেহারা (সত্তা) ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল, সিদ্ধান্ত তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৮৮)*।

এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিছালাত প্রাপ্তির স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' *(আল-ফাতহ, ৪৮/২৯)*। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের মধ্যেকার কোনো পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা' *(আল-আহযাব, ৩৩/৪০)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 'আর তোমরা ছালাত ক্বায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো' *(আল-বাক্বারা, ২/৪৩)*। আল্লাহ তাআলার নির্দেশসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে

যেন ছিয়াম পালন করে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'আর সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী' *(আলে ইমরান, ৩/৯৭)*। এগুলো প্রত্যেকটিই ইসলামের রুকন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। ছালাত ক্বায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের ছিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ পালন করবে'। 'ঈমান হলো, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে'। 'ইহসান হলো, এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাকে নাও দেখ, তাহলে ভাববে তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১]

হে মুমিনগণ! হে পবিত্র বায়তুল্লাহর হাজীগণ! বিদায় হজ্জে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহাসিক খুৎবাহর অংশ বিশেষ হলো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নির্ধারিত হয় কেবল তাক্বওয়ার কারণেই'।[২] নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, এ মাসে, এ শহরে, এ দিনটি তোমাদের জন্য যেমন সম্মানিত, তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জান, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইযযত-আবরুকে তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন।[৩] অতএব, ভাষা, বর্ণ, জাতিগত পার্থক্য কখনোই মতভেদ ও দ্বন্দ-বিবাদের জন্যে যুক্তিযুক্ত কারণ নয়। বরং এগুলো হলো মহাবিশ্বে আল্লাহ তাআলার নির্দশনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে' *(আর-রূম, ৩০/২২)*। এছাড়াও আরো কিছু দলীল রয়েছে যা উক্ত বিষয়ের গুরুত্বকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলার জামাআতবদ্ধ থাকার নির্দেশ, পরস্পর সহযোগিতা ও ভালোবাসা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ পছন্দ করেন, তা হলো— (১) তোমরা তাঁরই ইবাদাত করবে, (২) তাঁর সঙ্গে কিছুই শারীক করবে না এবং (৩) তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু মযবূতভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।[৪] এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবকে একতাবদ্ধ সঙ্গীসাথী দিয়ে অনুরূপ অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমীনে যা আছে, তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান' *(আল-আনফাল, ৮/৬২-৬৩)*। আল্লাহ তাআলা বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে নিষেধ বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে অবগত করবেন' *(আল-আনআম, ৬/১৫৯)*।

যখনই সমাজে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয় তখন মানুষের অন্তরে খারাপ প্রবৃত্তি, হিংসা বিদ্বেষ ও ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা-অভিলাষের সৃষ্টি হয়। যার ফলে রক্তপাত ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনের মতো ঘটনা ঘটে থাকে। আর তা উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর বিধান পালনে বিঘ্নতার সৃষ্টির করে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানবদেহের ন্যায় যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন তার সমস্ত দেহ ডেকে আনে তাপ ও অনিদ্রা'।[৫] তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৮।
২. আহমাদ, হা/২৩৪৮৯।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৪২।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৫।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৬।

আরো বলেন, ‘একজন মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিনের জন্য একটি অট্টালিকা সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে’।[৬]

আর আল্লাহর সাহায্য কেবল ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপনকারীদের সাথেই। আর যে ব্যক্তি জামাআতবদ্ধ জীবন থেকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে শয়তান তার সঙ্গী হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, ‘আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করেছে তারা চরম মতভেদে পড়ে আছে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭৬)*। আর এ লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলা মতভেদ ও মতবিরোধের সময়ে কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও— যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ‘আর যে কোনো বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই’ *(আশ-শূরা, ৪২/১০)*। অন্যত্রে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ‘আমি তোমার প্রতি কিতাব এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি সে সকল বিষয় স্পষ্ট করে দিতে পার যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল, আর (এ কিতাব) বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ’ *(আন-নাহল, ১৬/৬৪)*। অনুরূপভাবে তিনি উত্তম চরিত্র ধারণ, অতি সুন্দর ব্যবহার ও পারস্পরিক দয়া অনুগ্রহের পরিচয় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো’ *(আলে ইমরান, ৩/১৫৯)*। এছাড়া তিনি তাদেরকে ধৈর্যধারণ, মানুষের ভুলত্রুটি ক্ষমা করার গুণে অলংকৃত হতেও উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধরো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন’ *(আল-আনফাল, ৮/৪৬)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ‘আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফেরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন’ *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩-১৩৪)*। ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ইসলাম পারিবারিক ও সামাজিক ঈমানী বন্ধনকে মযবূত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। সেজন্য আল্লাহ তাআলা নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন এবং স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি প্রভৃতির পারস্পরিক হক্ব সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তোমরা ইবাদাত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহংকারী’ *(আন-নিসা, ৪/৩৬)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি’।[৭]

সম্মানিত হাজীগণ! আপনারা রবের নিকটে দু‘আ অব্যাহত রাখুন। নিজের জন্য দু‘আ করুন, প্রিয়জনদের জন্যে এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য দু‘আ করুন, যাতে আল্লাহ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দেন এবং সত্যের উপরে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখেন। আর তাদেরকেও দু‘আই ভুলবেন না যারা আপনাদের প্রতি ইহসান করেছেন।

হে আল্লাহ! হাজীগণের হজ্জকে কবুল করুন। তাদের জন্য সকল বিষয়সমূহ সহজ করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি মুসলিম নর-নারীদেরকে ক্ষমা করে দিন। তাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করে দিন। তাদের অন্তরে ইছলাহ দান করুন।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৫।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৮।

ভাইরাল রোগে আক্রান্ত হবেন না!

-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান*

বর্তমান সময় প্রায়শই দেখা যায় উঠতি বয়সের শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতি এমনকি ছোট-বড় অনেকেই এখন নিজেকে একটু প্রকাশ করার জন্য বেছে নেয় নানান ধরনের পথ। আর এ পথ বেয়ে যাচ্ছে হাজারো মানুষ। নিজেকে কীভাবে বাহিরের দুনিয়ায় প্রকাশ করা যায় এ জন্য বেছে নেয় তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম— ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব, এমনকি টিকটক ইত্যাদি। শুধু একটাই নেশা তা হচ্ছে 'আমাকে ভাইরাল হতে হবে'; 'আমাকে সেলিব্রেটি হতে হবে'। আর এই ভাইরাল হওয়া আজ এক প্রকার নেশায় পরিণত হয়েছে। আপনাদের সাথে এই 'ভাইরাল' নিয়েই আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

প্রথমত, আমাদের জেনে নেওয়া যাক ভাইরাল শব্দের শাব্দিক অর্থ কী? খোলাসা করে বলতে গেলে এটির শাব্দিক অর্থ নেই বললেই চলে। এটি কেবল ভাবার্থেই ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটির উৎপত্তি হলো 'ভাইরাস' শব্দ থেকে। আর ভাইরাস শব্দটি মূলত ইংরেজি বর্ণমালার V, I, R, U এবং S-এর সমন্বিত রূপ, যেগুলো আলাদাভাবে পূর্ণাঙ্গ একেকটি শব্দ। অর্থাৎ ভাইরাস শব্দটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ, যার পূর্ণরূপ হলো, 'Vital Information Resources Under Seize' (ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডার সিজ)। অর্থাৎ ভাইরাস (Virus) শব্দটিকে Noun (বিশেষ্য) ধরে এটির Adjective বা গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ) হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভাইরাল (Viral) শব্দটি। আর ভাইরাস শব্দটি যেহেতু দূষণ, জীবাণু বা বিষাক্ত— এ ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং ভাইরাস যেহেতু খুব দ্রুতই ভয়ংকরভাবে ছড়িয়ে পড়ে বা বিস্তার লাভ করে, তাই হঠাৎ সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া কোনো বিষয় বা ইস্যুকেই 'ভাইরাল' বলে উল্লেখ করা হয়।[১]

সুতরাং আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে, ভাইরাল আসলে এক প্রকার ভাইরাসের মতো, যা অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই হিসেবে আজ আমাদের অনেক ভাই-বোন এই ভাইরাসে আক্রান্ত। খুব সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীরা ভাইরাল হতে গিয়ে মৃত্যু কিংবা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পেয়ে আত্মহত্যার মতো জঘন্য পাপে পা দিচ্ছে।

কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের আজ একটা অংশ টিকটকের মতো জঘন্য অ্যাপস ব্যবহার করে মৃত্যুর ফাঁদে পা দিচ্ছে। কারণ একটাই 'আমাকে ভাইরাল হতে হবে'। এইতো বেশ কয়েক মাস আগের ঘটনা— গত ৮ জুলাই নোয়াখালীর চাটখিলে টিকটক ভিডিও বানানোর সময় অসাবধানতাবশত পা পিছলে সানজিদা আক্তার (১১) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়। এরপর ১১ জুলাই কুমিল্লায় চলন্ত ট্রেনের ছাদে টিকটক করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মেহেদী হাসান (১৫) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। এছাড়াও টিকটক ভিডিও আপলোড করাকে কেন্দ্র করে ২০১৯ সালের মার্চে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আরাফাত খুন হয়।[২]

শুধু যে টিকটক করতে গিয়েই মৃত্যু তা কিন্তু নয়; এরকম আরও সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে যে কত শত কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণী আত্মহত্যা ও মৃত্যুবরণ করেছে তার কোনো হিসাব নেই। বিশেষ করে ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রামে সামান্য লাইক ও কমেন্টের জন্য একজন আরেকজনকে আহত করছে, দিনশেষে দিতে হচ্ছে কত যে প্রাণ তা আর নাই-বা বললাম। সব কিছুর মূলে রয়েছে 'আমাকে ভাইরাল হতে হবে'।

এই ভাইরাল হওয়ার পিছনে একটা অংশ কাটে ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম ও টিকটকে, যা বলতে গেলে একেবারেই সময়ের অপচয়। তাছাড়াও অনর্থক কথাবার্তায় কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অথচ সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সময়ের শপথ করে বলেন, ﴿وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ 'সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(আল-আছর, ১০৩/১-৩)*। অন্য আয়াতে প্রকৃত মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ 'তারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৩)*।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৪০ নং পৃষ্ঠায়)

* দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০।

১.https://www.deshrupantor.com/specially/2019/12/09/185737.

২.https://www.jagonews24.com/technology/article/777307# চলতি বছর টিকটক করতে গিয়ে ১০ জনের মৃত্যু।

নারীর ডিজিটাল পর্দা ও পুরুষের স্বীয় পর্দায় উদাসীনতা

*-সুরাইয়া বিনতে মামূনুর রশীদ**

‘পর্দা’ নারী জাতিকে আদর্শের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমান নারীসমাজের পর্দার বেহাল দশা দেখে হৃদয়টা নিদারুণ কষ্ট অনুভব করে। যার ফলশ্রুতিতে কাঁচা হাতেই পাকা কাজ করার তীব্র বাসনা মানসপটে উঁকিঝুঁকি দেয়। বক্ষমাণ প্রবন্ধটিকে আমরা দু’টি ভাগে সন্নিবেশিত করেছি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

(১) নারীর ডিজিটাল পর্দা :

‘ডিজিটাল পর্দা’ শব্দটা দৃষ্টিগোচর হতেই তৎক্ষণাৎ মানসপটে কিঞ্চিৎ ভাবনার উদ্ভব ঘটে। কেন এই ডিজিটাল পর্দার নামকরণ? সূচনালগ্নে তো পর্দাকে শুধু পর্দা বলেই আখ্যায়িত করা হতো; কিন্তু বর্তমানে কেন ‘ডিজিটাল’ শব্দের সংযোজন?

আসলে পর্দা শব্দটা তার নিজস্ব গতিতে চলমান ছিল। কিন্তু যখনই শব্দটা ছিনতাই হয়েছে, ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে ভেজাল, তখনই তার সাথে সংযোজন করা হয়েছে ‘ডিজিটাল’। তারপর সূচনা হয়েছে এর প্রকারভেদের।

উদাহরণস্বরূপ সূচনালগ্নে সরিষার তেল আপন নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু যখনই সেটাকে ভেজালের ঘ্রাণে সুসজ্জিত করা হয়েছে, তখনই তা বিভক্ত হতে শুরু করেছে খাঁটি ও ভেজালে। অনুরূপ ‘হাদীছ’ শব্দটা সূচনালগ্নে আপন গতিতে চলমান ছিল। কিন্তু যখনই তার মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে, তখনই তা ছহীহ, যঈফ জাল ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়েছে।

সুতরাং আজকের সমাজে পর্দা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই পর্দা শব্দের সাথে ডিজিটাল শব্দ সংযোজন করা হয়েছে।

যাহোক মূল পয়েন্টে ফেরা যাক। ইসলামে নারীদের পর্দা করার আদেশ করা হয়েছে। কেমন পর্দা করবে নারীরা? আজকের সমাজ যেভাবে চায়, অবশ্যই সেভাবে না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেভাবে চান সেভাবে।

নারীদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পর্দা যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের বোনেরা পর্দার মাঝে খুঁজে ফেরেন বাহ্যিক স্মার্টনেস। বোরকার মাঝেই নিজেকে কামনীয়-মোহনীয় করার যারপরনাই চেষ্টা করেন। আজকের অধিকাংশ নারীসমাজ পর্দার নামে অশালীন, টাইটফিট, আকর্ষণীয়, নকশা করা, জাঁকজমক এমন সব বোরকা পরিধান করেন, যার দ্বারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহাবয়ব সহজেই আন্দাজ করা যায়।

এক শ্রেণির নারীসমাজ স্বীয় আপত্তিজনক চালচলন, হাঁটাচলা, হাবভাব, চাহনি, সুগন্ধি, হাসি ও মোহনীয় কথা, এমনকি ইসলামের অপব্যবহার তথা সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পাঠ কিংবা ইসলামী সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যতিব্যস্ত। যার ফলশ্রুতিতে পুরুষের সামান্য ক্রিয়াতেই নিজেকে সঁপে দিতে চায়। যদিও এরা এক প্রকার বোরকা পরিধান করেন। এ সকল নারী বোরকা পরেই যৌন আবেদনময়ী আচরণ প্রদর্শন করে থাকেন। যার দরুণ ব্যভিচারের ছিদ্রপথ উন্মোচিত হয়। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যভিচার তো দূরের কথা, তার সূত্রপাত ঘটার সম্ভাবনা থাকে এমন দরজা বন্ধ রাখার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ‘তোমরা ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কর্ম ও মন্দ পথ’ *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

সুতরাং হে বোন! আপনি আল্লাহর দেওয়া বিধান পালন করার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়ে দিবেন না। পূর্ণ পর্দা করে শালীনতা বজায় রেখে চলাফেরা করুন। যৌন আবেদনময়ী প্রসাধনী এবং আচরণ থেকে নিজেকে হেফাযতে রাখুন। সফলতা আপনাআপনি আপনার কাছে ধরা দিবে ইনশা-আল্লাহ।

লেখনির এ লগ্নে আল্লাহ যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ‘তুমি কি মানুষদের সৎ কাজের আদেশ কর আর নিজের কথা ভুলে যাও? অথচ তুমি মহান আল্লাহর কিতাব পড়; তুমি কি বুঝ না?’ *(আল-বাক্বারা, ২/৪৪)*।

---

* মা’হাদ ২য় বর্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা), ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

পুরুষের স্বীয় পর্দায় উদাসীনতা :

‘পর্দা’র কথাটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে এক নারীর চিত্র। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শুধু পর্দা নারীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তার দরুণ পুরুষরা নারীদের পর্দা নিয়ে কথা বলতে বেশ মজা পান। ‘নারীরা পর্দা করেন না’ এর মধ্যে তাদের এলার্জি নিহিত। বিশেষ করে নারীরা কেন পরিপূর্ণ পর্দা করেন না- এ নিয়ে তাদের সারা শরীরে এলার্জি। যা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার ফলে চামড়া ছুলে যাওয়ার উপক্রম। অবশেষে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবুও নিবারণের চেতনা নেই। ঠিক আছে, আপনি নারীদের সতর্ক করছেন ভালো কথা। খুবই ভালো কথা। আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনার স্ত্রী, কন্যা আর বোনকে অবশ্যই আপনি আন্তরিকভাবে বুঝাবেন। বুঝাতে হবে আপনাকেই। তা না হলে এরাই আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلا كُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وولدِهِ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنهُ أَلا فكُلُّكُمْ راعٍ وكلكُمْ مسؤولٌ عَن رعيته.

‘সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর (পরকালে) নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল লোক, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও সন্তানসন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি কোনো গোলাম বা চাকর-চাকরাণীও তার মুনীবের ধনসম্পদের উপর একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে’।[১]

১. ছহীহ বুখারী, হা/৮৯৩।

আপনাকে একটা কথা বলি। নিজের হিসাবের কথা অবগতিতে আছে কি আপনার? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ‘তোমরা কি মানুষদের সৎ কাজের আদেশ কর আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা মহান আল্লাহর কিতাব পড়; তোমরা কি বুঝ না?’ *(আল-বাক্বারা, ২/৪৪)*।

আপনার কবরে কিন্তু আপনাকেই যেতে হবে। একাই থাকতে হবে সেখানে। বিচারের মুখোমুখি একাই হবেন আপনি। প্রশ্নের উত্তর আপনাকেই দিতে হবে। মিথ্যা বলবেন? কোনো লাভ নেই। কেননা আল্লাহ আপনার মুখ বন্ধ করে দিবেন। তিনি আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর সাথেই কথা বলবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ‘আজ আমরা তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দিব। তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দিবে তারা কি কাজ করে এসেছে’ *(ইয়াসীন, ৩৬/৬৫)*।

আচ্ছা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আপনাকেও পর্দার বিধান দিয়েছিলেন, সে কথা কি মনে পড়ে না? একটু খেয়াল করার চেষ্টা করুন তো! ভালো করে খুঁজে দেখার চেষ্টা করুন! যে আয়াতে মেয়েদের পর্দার কথা বলা হয়েছে, তার পূর্বের আয়াতেই আপনার পর্দার কথা বলা হয়েছে। দৃষ্টিকে সংযত রেখে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ ‘মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে’ *আন-নূর, ২৪/৩০)*।

জী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আগে আপনাকে পর্দা করতে বলেছেন, তারপর নারীদের। নারীরা পর্দা করেন না, তাই আপনি হা করে তাকিয়ে থাকেন। তাদেরকে নিয়ে নোংরা কল্পনা করেন। ওরা দেখায় তাই আপনি দেখেন। এই যুক্তিগুলো নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন আপনি? পারবেন না। আসলেই আপনি পারবেন না। আপনার হিসাব নেওয়ার জন্য যদি আপনাকেই মনোনীত করা হয়, আর আপনি যদি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে বিচার করেন, তাহলে আপনিই

অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত শ্রেণির লোককে বিশেষ ছায়ার আশ্রয় দিবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (তার মধ্যে এক শ্রেণি হলো) এমন ব্যক্তি, তাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে নিজের মনস্কামনা পূরণের লক্ষ্যে আহ্বান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি’।[২]

কোনো নারীর আপত্তিজনক প্রস্তাবের উপর যে যুবক বলতে পারবে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, সেই থাকবে বিশেষ ছায়াতলে। আচ্ছা, আপনি কি এমন যুবকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন? হতে পেরেছেন তাদের মতো তাক্বওয়ার অধিকারী? আপনাকে তো আহ্বান করতে হয় না। সদা-সর্বদা আপনিই অগ্রগামী হন। যার ফলশ্রুতিতে নন মাহরাম নারীকে মেসেজ পাঠান। চ্যাট করেন মেসেঞ্জারে। পর নারীর সাথে কথা বলেন মিষ্টি সুরে।

আরে আজিব তো! পর্দা যে আপনার জন্যও এসেছে, আপনাকেও যে আল্লাহ পর্দা করার আদেশ করেছেন, সেটা আপনি ভুলে যান! বাস্তবায়ন করতে চান না স্বীয় যিন্দেগীতে। নিজের খেয়ালখুশি আর অন্তরের কামনার পূজা করে একে অস্বীকার করতে চাচ্ছেন? **আপনাকে আল্লাহ দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ করেছেন।** আপনি জেনেশুনে তার আদেশ অমান্য করে তাঁকেই অস্বীকার করছেন না তো?

অস্বীকার যদি না-ই করেন, তাহলে রাস্তায় আপনার চোখ হাওয়া খুঁজে কেন? রাস্তা দিয়ে চলার সময় বোরকাওয়ালী থেকে শুরু করে পর্দাহীনা, এমনকি টিভি-সিনেমার মেয়েটার দিকেও আপনি হা করে তাকিয়ে থাকেন কেন? কী দেখেন আপনি? নিজেকে-না মুসলিম দাবি করেন আপনি? ছি!

নিজের মা, মেয়ে আর বোনকে নিয়ে রাস্তায় একদিন বের হন আর ভালো করে চারপাশের পুরুষগুলোর চোখের দিকে লক্ষ করুন। খেয়াল করবেন, ওই চোখগুলো তাদের দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে? কী দেখছে? কীভাবে দেখছে? টগবগ করবে রক্ত আপনার। চোখ তুলে ফেলতে ইচ্ছা করবে তাদের। একবার ভাবুন তো! আপনি যাদের দিকে তাকান তারাও কিন্তু কোনো ভাইয়ের মা, বোন কিংবা স্ত্রী। আজ তারা উদাসীনতার কারণে ইসলাম তেমন একটা জানেন না। যার ফলশ্রুতিতে মানেন না। তাদের কবরে তারা যাবেন। কিন্তু আপনি? আপনি কি জেনেশুনে সজ্ঞানে তাদের একজন নন! যাদের দেখে আপনার রক্ত টগবগ করার উপক্রম? চোখের দৃষ্টি সংযত না করে আপনি যেনা করছেন। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ‘তোমরা যেনার ধারেকাছেও যেও না। নিঃসন্দেহে এটি অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ’ *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

যেনার আশপাশে যেতে আল্লাহ আপনাকে নিষেধ করেছেন। যেনা করা তো দূরের কথা। আর আপনি? আপনি যেনা করছেন তো করছেনই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ। ‘চোখের যেনা হলো (যা হারাম সেদিকে) তাকানো’।[৩]

সুতরাং নিজের চোখকে সংযত রাখার প্রাণপণে চেষ্টা করুন। সফলতা আপনার পদচুম্বন করবেই করবে ইনশা-আল্লাহ।

লেখনির শেষলগ্নে বলতে চাই, কথাগুলো আসলে নিজেকেই বলা। স্বীয় আত্মাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া মাত্র। তাই এই লেখাটা সবার আগে আমার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ‘তোমরা কি মানুষদের সৎকাজের আদেশ কর আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা মহান আল্লাহর কিতাব পড়; তোমরা কি বুঝ না?’ *(আল-বাক্বারা, ২/৪৪)*।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০।

মৃত্যুর স্মরণ!

-আদিল আলাবি*

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সমীপেই ফিরে যেতে হবে। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

এই ধরার বুকে যারাই আগমন করেছে, তাদেরই পালাক্রমে আপন গন্তব্যের দিকে যেতে হবে। আজ আমরা যারা এই ধরাতে অবস্থান করছি, আজ থেকে ১০০ বছর পর কেউ হয়তো থাকব না। সকলকেই পাড়ি জমাতে হবে না ফেরার দেশে, যেখানে কেউ গেলে আর ফিরে আসে না। আজ যে প্রতাপ ও দাপট নিয়ে চলছি কিছুকাল পর সেই দাপটের উপর মৃত্যু এসে হানা দিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ 'বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে' *(আল-জুমুআ, ৬২/৮)*।

মৃত্যুর হাত থেকে যদি কেউ মুক্তি পেত, তাহলে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ মুক্তি পেতেন। তাঁকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। হাদীছে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا الْوَجَعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হয়েছে এমন কাউকে দেখিনি'।[১] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ 'নবী ﷺ আমার বুক ও চিবুকের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই নবী ﷺ-এর পর আর কারো মৃত্যু যন্ত্রণাকে আমি খারাপ মনে করি না'।[২] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, '...তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তাতে তিনি ﷺ উভয় হাত ঢুকিয়ে হাত দুটি দ্বারা আপন চেহারা মাসাহ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি ﷺ বলছিলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ, অবশ্যই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভীষণ'। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে থাকলেন, فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى অর্থাৎ 'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করো)'-এ কথা বলতে বলতে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর হাত নিচে নেমে আসে'।[৩]

এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবের মৃত্যুর অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে! একটু ভাবনার চাদর এপাশ-ওপাশ করুন! আমরা আমাদের জীবনের শেষ সময়ের কথা কতটুকু চিন্তা করি! আমাদের সামনে যখন মৃত্যু হাযির হবে, তখন কেমন ব্যবহার করা হবে আমাদের সাথে! আমাদের মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরপত্তা ও শান্তির বার্তা শোনানো হবে নাকি আযাব ও শাস্তির বার্তা শোনানো হবে? আমাদের কোন জিনিস মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে? সমাজের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করে। তারা মনে করে চিরকাল দুনিয়াতে অবস্থান করবে। কখনই মৃত্যুবরণ করবে না! অথচ মৃত্যু তাদের নিকটে অবস্থান করছে। নির্দিষ্ট সময় আসার সাথে সাথেই তার সাথে আলিঙ্গন করতে হবে! একজন কয়েদী যখন জানতে পারে কিছুদিন পর তার ফাঁসি দেওয়া হবে, তখন কি সে শান্তিতে ঘুম ও তৃপ্তিসহকারে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে? না, সে কখনো তা পারে না! ঠিক তেমনিভাবে আমরাও কি অঘোষিত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নই? মৃত্যু যে কোনো সময় আমাদের সামনে হাযির হতে পারে।

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سبيلٍ وعُدَّ نفسَكَ فِي أهل الْقُبُور 'পৃথিবীতে অপরিচিত মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মতো জীবন-যাপন করো। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে করো'।[৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا

---

* মা'হাদ ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭০; মিশকাত হা/১৫৩৯।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪৬; মিশকাত হা/১৫৪০।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪৯; মিশকাত হা/৫৯৫৯।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/৫২৭৪।

تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাত দিয়ে আমার দু'কাঁধ ধরলেন। তারপর বললেন, 'দুনিয়ায় তুমি এমনভাবে থাকো, যেমন- তুমি একজন গরীব অথবা পথের পথিক'। (এরপর থেকে) ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা (মানুষদেরকে) বলতেন, সন্ধ্যা হলে আর সকালের অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে, সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। নিজের সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ করবে অসুস্থতার আগে ও জীবনের সুযোগ গ্রহণ করবে মৃত্যুর আগে।[৫]

আমাদের পূর্বপুরুষগণ মৃত্যু ও আখেরাতের ব্যাপারে কতটা সচেতন ও সতর্ক ছিলেন! আর আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে কতটা সজাগ ও আখেরাতের ব্যাপারে কতটা গাফেল ও উদাসীন, তা আমাদের দুনিয়ার জীবনে চলাফেরা দেখে কিছুটা আঁচ করা যায়।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(আল-মুনাফিকূন, ৬৩/৯)*।

হায় আল্লাহ! আমরা যা করছি তা কি আমাদের ক্ষতির সামনে দাঁড় করাবে না!

এখনো কি আমাদের আল্লাহর সামনে ফিরে আসার সময় হয়নি! অতএব হে জ্ঞানী! মৃত্যু থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন। মৃত্যু আসার আগেই নিজের জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করুন। নিজেকে প্রস্তুত করুন মৃত্যুর জন্য। যেন আল্লাহর সামনে হাস্য চেহারা নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। বেশি বেশি তাঁর যিকির করুন।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে আমাদের এই প্রার্থনা! প্রভু আমাদের সকলকে মৃত্যুর পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আপনার সামনে হাযির হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

'ভাইরাল রোগে আক্রান্ত হবেন না!' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

এছাড়াও আমরা হাদীছে দেখতে পাই— আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা' *(ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৭৬, হাদীছ ছহীহ)*। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদম ও স্ব-স্থান হতে নড়তে দেওয়া হবে না— (১) তার জীবনকাল কীভাবে অতিবাহিত করেছে, (২) যৌবনের সময়টা কীভাবে ব্যয় করেছে, (৩) ধনসম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে, (৪) তা কীভাবে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কিনা' *(তিরমিযী, হা/২৪১৬, হাদীছ হাসান)*।

আবার ভাইরালের পিছনে লোকদেখানো একটা প্রবণতা থেকেই যায়, যার ফলশ্রুতিতে মানুষকে করতে হয় নানা ধরনের আঞ্জাম। এমনকি মানুষ অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করে না। অথচ আমরা হাদীছে দেখতে পাই— নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লোক-শোনানো ইবাদাত করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার লোক-শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোকদেখানো ইবাদাত করবে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার লোকদেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯৯)*।

এই ভাইরাল হওয়া রোগে যে শুধু সাধারণ মানুষই আক্রান্ত তা কিন্তু নয়, বরঞ্চ আমাদের আলেম সমাজও আজ এই রোগে আক্রান্ত। হয়তো অনেকেই অবাক হবেন যে, আলেম সমাজ আবার কীভাবে ভাইরাল রোগে আক্রান্ত। হ্যাঁ, সত্যিই আজ আমাদের আলেম সমাজও ভাইরাল রোগে আক্রান্ত।

আপনি একটু ওয়ায-মাহফিলের ময়দানগুলো লক্ষ করলেই দেখবেন যে, কীভাবে আজ আমাদের কিছু আলেম নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মানুষকে ওয়ায-নছীহতের নামে হাসাচ্ছে। নানা ধরনের গান-কৌতুকের মাধ্যমে মানুষকে মজিয়ে রাখছে। তাছাড়া এক বক্তা ভাইরাল হওয়ার জন্য আরেক বক্তার নামে নানা ধরনের গীবত পর্যন্ত করে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ 'তোমরা একে অপরের যেন গীবত না কর। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ পছন্দ করে? অনন্তর তোমরা তা অপছন্দ কর' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে এ রোগ থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

প্রভুর হুকুমে

-মো. শফিকুল ইসলাম
ভুয়াপুর, টাংগাইল।

পূর্বাকাশে রোজ সকালে
সূর্যি মামা উঠে,
হরেক রকম ফুল কলিরা
কানন ভরে ফোঁটে।
মাটির বক্ষে ফসল ফলে
বৃষ্টিতে পায় প্রাণ,
পাখির কণ্ঠে নিত্য শুনি
মিষ্টি মধুর গান।
দখিনা হাওয়া ধানের শীষে
ঢেউয়ের খেলা তুলে,
কবি মনে নতুন ভাবনা
জাগায় দুলে দুলে।
ফুল বাগানে প্রজাপতির
নিতুই বসে মেলা,
কারুকাজে ডানা ভরা
খোকার জমে খেলা।
জোয়ার ভাটা নিত্য ঘটে
মিঠা স্বাদু পানি,
কেউ মিশে না কারও সাথে
প্রভুর হুকুম মানি।
সন্ধ্যা বেলা বাঁশ ঝাড়েতে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
মিটি মিটি ছড়ায় আলো
জোনাক ঝাঁকে ঝাঁকে।
জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোয়
ধু-ধু বালুর চর,
হেরার জ্যোতি ছড়ায় যেন
স্তরের প'রে স্তর।

দেশটা আমার

-মো. ফরহাদ খান
মীরগঞ্জ, চান্দিনা, কুমিল্লা।

দেশটা আমার মনের মায়া
দেশটা আমার মাতৃছায়া,
দেশটা আমার সুন্দর বনের
মায়া ভরা ছবি আঁকা।
দেশটা আমার সিলেটেরই
বিশ্বসেরা চায়ের বাগান,
দেশটা আমার রাজশাহীর
মিষ্টি মধুর আমের বাগান।
দেশটা আমার রাঙামাটির
সবুজ গাছে পাহাড় ঘেরা,
দেশটা আমার লক্ষ শহীদের
বুকের তাজা রক্তে কেনা।
তাই দেশের স্বার্থে আমরা সবাই
হয়ে যাই ভাই ভাই,
দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা
পাবে না বাংলার যমীনে ঠাঁই।

জীবন

-আফিফা বিনতে ফায়ছাল
দশম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

জীবনটা করো জয়
অলসতা করে নয়।
জীবনটা করো জয়
রণ করেই হয়।
ঝড়-ঝঞ্ঝাট আসবেই
ভেঙে পড়ো না কোনোভাবেই।
ধৈর্যের সাথে করো লড়াই
তবেই হবে তুমি কৃতার্থময়।
জীবন কোনো মুক্ত বিহঙ্গ নয়;
পরীক্ষার পর পরীক্ষা রয়।
জগৎ চেতনায় বাড়াও কদম তোমার
জয়ের ফুল ফুটবেই একবার।
হয়ো না কখনো নিরাশ তুমি
ধৈর্যের ফল কৃতার্থময়ী।

বাংলাদেশ সংবাদ

ঢাকায় প্রতি ৪০ মিনিটে ১টি তালাক হচ্ছে

সারা দেশে বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে। বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি। বিচ্ছেদ বাড়ছে ঢাকার বাইরেও। বিচ্ছেদের আবেদন নারীরা বেশি করছেন। বিচ্ছেদের আবেদনের পর সমঝোতা হয়েছে খুবই কম তথা ৫ শতাংশের নিচে। ঢাকার দুই সিটির কার্যালয়ের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে তালাকের আবেদন এসেছিল মোট ১৩ হাজার ২৮৮টি। এ হিসাবে রাজধানীতে প্রতিদিন ভেঙে যাচ্ছে প্রায় ৩৭টি দাম্পত্য সম্পর্ক, অর্থাৎ তালাকের ঘটনা ঘটছে ৪০ মিনিটে ১টি করে। আর চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আবেদনের সংখ্যা ২ হাজার ৪৮৮। ২০২০ ও ২০২১ সালেও রাজধানীতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনের সংখ্যা ছিল ১২ হাজারের বেশি। ঢাকার দুই সিটির মেয়রের কার্যালয়ের তথ্য অনুসারে, এই দুই বছরে আবেদন জমা পড়েছে যথাক্রমে ১২ হাজার ৫১৩ এবং ১৪ হাজার ৬৫৯টি। গত চার বছরে তালাক হয়েছে ৫২ হাজার ৯৬৪টি। দুই সিটি করপোরেশনের তথ্যে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন বেশি আসতে দেখা যাচ্ছে স্ত্রীদের পক্ষ থেকে। প্রতি ১০টি আবেদনের প্রায় ৭টি করেছেন স্ত্রী। বিবাহবিচ্ছেদ যে কয়েক বছর ধরে বাড়ছে, তা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) তথ্যেও দেখা যায়। বেশি বাড়ছে শিক্ষিত দম্পতিদের মধ্যে। বিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৫ বছর ধরে তালাকের হার ঊর্ধ্বমুখী। সবচেয়ে বেশি তালাক হয় রাজশাহী বিভাগে আর কম হয় সিলেটে।

সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহরের তালিকায় ৭ম ঢাকা

ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (EIU) প্রকাশিত ‘গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স ২০২৩’ থেকে জানা গেছে, বিশ্বের সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহরের তালিকায় এবারও ৭ম স্থানে রয়েছে ঢাকা। পাঁচটি ক্যাটেগরির ওপর ভিত্তি করে বাসযোগ্যতার তালিকায় স্থান দেওয়া হয় শহরগুলোকে। পাঁচটি ক্যাটেগরির মধ্যে রয়েছে— স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামো। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজধানী ঢাকা ১০০ এর মধ্যে গড় ৪৩.৮ স্কোর নিয়ে এ বছরের বৈশ্বিক বাসযোগ্যতার সূচকে ১৭৩টি শহরের মধ্যে ১৬৬তম অবস্থানে রয়েছে। ঢাকার সাথে যুগ্মভাবে একই অবস্থানে রয়েছে জিম্বাবুয়ের হারারে। ২০২২ ও ২০২১ সালে ঢাকার স্কোর ছিল যথাক্রমে ৩৯.২ এবং ৩৩.৫। এদিকে বাসযোগ্য শহরের তালিকার শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা; এরপরেই আছে একে একে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও সিডনি, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার; সুইজারল্যান্ডের জুরিখ, কানাডার ক্যালগেরি, সুইজারল্যান্ডের জেনেভা, কানাডার টরন্টো এবং জাপানের ওসাকা। এদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় ৩২.৫ স্কোর নিয়ে পাকিস্তানের করাচি রয়েছে পঞ্চমে। সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহরের তালিকায় এসেছে সিরিয়ার দামেস্ক, লেবাননের ত্রিপোলি, আলজেরিয়ার আলজিয়ার্স, নাইজেরিয়ার লাগোস, পাকিস্তানের করাচি, পাপুয়া নিউগিনির পোর্ট মোর্সবি, বাংলাদেশের ঢাকা ও জিম্বাবুয়ের হারারে, ইউক্রেনের কিয়েভ ও ক্যামেরুনের দৌয়ালার নাম।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

চালু হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম ভাসমান ও চলমান শহর

আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে বিরাজ করত প্যানজিয়া নামে এক বিরাট মহাদেশ। সেই মহাদেশ বিলীন হয়ে যাওয়ার ২০ থেকে ৩৩ কোটি বছর পর সেই নামেই একটি ভাসমান ও চলমান শহর তৈরি হতে যাচ্ছে সঊদী আরবে। সঊদী আরবের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্যানজিওসই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাসমান কাঠামো। তৈরি হতে যাওয়া এই অতিকায় ইয়টটির দৈর্ঘ্য হবে ৫৫০ মিটার বা ১৮০০ ফুট এবং প্রস্থ হবে ৬১০ মিটার বা ২০০০ ফুট। অতিকায় এই ইয়টটির আকৃতি হবে অনেকটা কচ্ছপের মতো। ইয়টটিতে থাকবে বিভিন্ন ধরনের হোটেল, আবাসিক ভবন, বাংলো, শপিং মল এবং পার্কসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা। এ ছাড়া ছোট ছোট বিভিন্ন জাহাজ ভেড়ানোর জন্য থাকবে ছোট আকারের বন্দর সুবিধাও। থাকবে বিমান এবং হেলিকপ্টার অবতরণের সুবিধাও। প্যানজিওস নামে এই ভাসমান ও চলমান শহরটি বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত থাকবে। শহরটির কাঠামোর নিচের দিকে সবমিলিয়ে বিভিন্ন আকৃতির ৩০ হাজার সেল থাকবে। যা শহরটিকে ভাসমান রাখতে সহায়তা করবে। এর যে অংশটুকু পানির নিচে থাকবে তার উচ্চতা হবে ৩০ মিটার বা ৯৮ ফুট। এ ছাড়া এই শহরটি সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ৫ নট বা ৯.২৮ কিলোমিটার বেগে চলতে পারবে। পুরো শহরটির জ্বালানি বা বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাবে এর দুটি ডানা। এই

ডানাগুলো সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ইয়টটির ইঞ্জিনকে চলতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া অতিকায় এই ইয়টটির ছাদে থাকবে সোলার প্যানেল যা পুরো শহরের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবে।

পৃথিবী ছেড়েছে ১০৮০০ কোটি মানুষ, জীবিত ৮০০ কোটি

যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাটে জনসংখ্যাবিষয়ক গবেষণা সংস্থা পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (PRB) প্রতিবছর বিশ্বের মোট জনসংখ্যার তথ্য প্রকাশ করে যাচ্ছে। প্রায় ২ লাখ বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৮০০ সালে ১০০ কোটির (এক বিলিয়ন) মাইলফলক স্পর্শ করলেও মাত্র ৩০০ বছরের মধ্যে আট গুণ বেড়ে বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৮০০ কোটি (৮ বিলিয়ন)। সম্প্রতি পৃথিবীর জনসংখ্যা ৮০০ কোটির (৮ বিলিয়ন) মাইলফলক ছাড়িয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে মানবজাতির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কত মানুষ মারা গেছে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য জানা নেই। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক মানুষের শুরু থেকে এ পর্যন্ত এই গ্রহ থেকে চিরবিদায় নিয়েছে মোট ১০ হাজার ৮০০ কোটি (১০৮ বিলিয়ন) মানুষ। সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবীতে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় সাত কোটি। আর চিরনিদ্রায় শায়িত হন আরও প্রায় সাত কোটি। গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক মানুষ (Homo Sapiens) যাত্রা শুরু প্রায় দুই লাখ বছর আগে।

মুসলিম বিশ্ব

২২৫ বছর পর ফের চালু হলো মিশরের ঐতিহাসিক মসজিদ

আল-জাহির বায়বার্স মসজিদ। আকার ও আয়তনের কারণে মিশরের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদের তকমা পেয়েছিল। তবে একটা সময় পর সংস্কারের অভাবে মসজিদটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। কেটে গেছে দীর্ঘ ২২৫ বছর। দীর্ঘ ২২৫ বছর পর ফের মিশরের ঐতিহাসিক 'আল-জাহির বায়বার্স' মসজিদে পবিত্র জুমআর ছালাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ জুন রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত এ মসজিদে জুমআর ছালাত পড়তে আসেন হাজার হাজার মুছল্লী। জানা গেছে, ১২৬৮ সালে মামলুক শাসনামলে মসজিদটি নির্মিত হয়। মামলুক সুলতান আল-জাহির বায়বার্স আল-বানদুকদারির নামে নামকরণ করা হয় মসজিদটির। ১৭৯৮ সালে মিশরে ফরাসি আগ্রাসনের পর মসজিদটি বেদখল হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ছালাত। এছাড়াও মসজিদের উঁচু উঁচু প্রাচীরের ওপর স্থাপন করা হয় উন্নতমানের কামান। সময়ের ফেরে মসজিদ প্রাঙ্গণ পরিণত হয় সামরিক কেন্দ্রে। ১৮০৫-১৮৪৯ সালে মিশরের অটোমান গভর্নর মুহাম্মাদ আলী পাশার শাসনামলে তা সাবান কারখানা অতঃপর সেনাবাহিনীর বেকারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তা কসাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন ধরে তা পরিত্যক্ত স্থান হিসেবে পড়ে ছিল। ২০০৭ সাল থেকে মিশর ও কাজাখস্তান সরকারের অর্থায়নে মসজিদটি পুনরুদ্ধার শুরু হয়। অবশেষে ২২৫ বছর পর পুনরায় ছালাত আদায় শুরু হয় মিশরের তৃতীয় বৃহত্তম এই মসজিদে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

হাজীদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছে রোবট

হজ্জ পালনে যাওয়া মুছল্লীদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছে রোবট। সঊদী আরবের মাসজিদুল হারাম এবং মসজিদে নববীতে বহুভাষী রোবট নানা পরিষেবা দিচ্ছে হাজীদের। বাংলাসহ মোট ১১টি ভাষায় কথা বলে এই রোবট। বিভিন্ন ভাষায় হাজীদের সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিচ্ছে রোবটগুলো। মূলত হজ্জ পালন সহজতর করতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) নানা ধরনের রোবট ব্যবহার করছে সঊদী প্রশাসন। রোবটগুলো হাজীদের যাতায়াতসহ নানা বিষয়ে দিকনির্দেশনার পাশাপাশি হজ্জের আচার-আনুষ্ঠানিকতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অবিকল মানুষের মতো হাত নেড়ে কথাও বলছে বিভিন্ন ভাষায়। এমনকি ইসলামিক স্কলারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে। মূলত হজ্জের নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন সহজ করতেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়েছে সঊদী প্রশাসন। বহুভাষী এই রোবট আরবী ছাড়াও বলতে পারে আরও ১০টি ভাষা। বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, পার্সি, তুর্কি, মালয়, উর্দূ, চীনা এবং হাউসা ভাষায় দিকনির্দেশনা দিতে পারে এই রোবট। প্রতিটি রোবটের টানা আট ঘণ্টা সেবা দেয়ার সক্ষমতা রয়েছে। দিকনির্দেশনা ছাড়াও রোবটের সাহায্যে স্মার্ট পরিষেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে মাতাফ জীবাণুমুক্তকরণ, যমযমের পানি ও পবিত্র কুরআন বিতরণ। হাজীদের গতিবিধি আর চলাফেরাও তদারকি করা হয় প্রযুক্তি সংযোগের মাধ্যমে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ করাই হলো মূলত একজন মুসলিমের করণীয়, সেখানে 'আহলেহাদীছ' বলাটা কতটুকু জরুরী?

-শাহীন
বগুড়া।

উত্তর : আল্লাহকে ইলাহ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই বাহ্যত মুসলিম। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণ ব্যতীত কোনো মানুষ প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না। উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পর যখন ফিতনা প্রকাশিত হয় এবং শিয়া ও খারেজী নামে দুটি ফিরকার আবির্ভাব হয় তখন থেকেই ছাহাবীগণ এই সমস্ত বাতিল ফিরকা থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্য আহলুল হাদীছ, আহলুস সুন্নাহ ইত্যাদি নামে নিজেদের বৈশিষ্টগত পরিচয় দেওয়া শুরু করেন। ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ছাহাবীগণ সনদ নিয়ে প্রশ্ন করতেন না। কিন্তু যখন ফিতনা শুরু হলো তখন তারা বলতে লাগলেন, তোমাদের বর্ণনাকারীদের নাম বল। যদি আহলুস সুন্নাহর কেউ হাদীছ বর্ণনা করত তাহলে তা গ্রহণ করা হতো। আর বিদআতী কেউ হলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো না (মুকাদ্দামা ছহীহ মুসলিম, হা/২৫)। 'আহলেহাদীছ' নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম নয়। বরং 'আহলেহাদীছ' একটি আক্বীদা ও আদর্শের নাম। যারা কুরআন-সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসরণে বিশ্বাসী। এর বিপরীতে অধিকাংশ লোকই কুরআন-সুন্নাহকে নিজেদের ইমামদের বুঝ, ফতওয়া ও যুক্তির আলোকে অনুসরণ করে থাকে, দলীলের বিপক্ষে গেলেও। এরাও কিন্তু মুসলিম। অপরদিকে আহলেহাদীছগণ দলীলের বিপরীতে কারো মতকে গ্রহণ করে না। তাই নিজের আক্বীদা, আদর্শ ও মানহাজ সুস্পষ্ট করার জন্য আহলেহাদীছ, সালাফী ইত্যাদি পরিচয় দেওয়াই উচিত (বিস্তারিত দেখুন- দুরূস লি শায়খিল আলবানী, ২০ খণ্ড, পৃ. ৯)।

প্রশ্ন (২) : দেহবাদী আক্বীদা কী? আহলেহাদীছ কি দেহবাদী আক্বীদায় বিশ্বাস করে?

-আহমাদ আলী
দুবাই।

উত্তর : দেহবাদী আক্বীদা হলো, সৃষ্টির মতো আল্লাহ তাআলার দেহ সাব্যস্ত করা। যেমন মানুষের হাতের মতো আল্লাহর হাত, পায়ের মতো তাঁর পা। যারা এ আক্বীদায় বিশ্বাসী তাদের বলা হয় মুজাসসিমা। আক্বীদা সম্পর্কে বিভ্রান্ত দলগুলোর মাঝে একটি হলো মুজাসসিমা। সালাফীদের আক্বীদা হলো আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা ও তার সাথে কোনো কিছুর তুলনা না দেওয়া। সালাফীগণ বিশ্বাস করেন আল্লাহর হাত আছে, পা আছে, তিনি দেখেন, শোনেন। কিন্তু কোনো কিছুই তার সৃষ্টির মতো নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তার মতো কিছুই নেই, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা' (আশ-শুরা, ৪২/১১)। নুআঈম আল-খোযায়ী বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দিল সে কুফরী করল এবং আল্লাহ যে গুণাবলি তার নিজের সম্পর্কে বলেছেন এগুলো যে অস্বীকার করল সেও কুফরী করল (মাজমাআ ফাতওয়া লি বিন বায, ৫/১৯৬)।

প্রশ্ন (৩) : স্বামী শিরকী ও কুফরী আক্বীদার হলে স্ত্রী হিসেবে আমার করণীয় কী? উক্ত স্বামীর হেদায়াতের জন্য কী কী কাজ করতে পারি?

-আবূ সাঈদ সিনান,
ডিমলা, নীলফামারী।

উত্তর : স্বামী যদি শিরকী বা কুফরী আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়, তাহলে স্ত্রীর করণীয় হলো তাকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া এবং তার এ পথ ও মত যে ভুল তাকে তা বোঝানো এবং এ পথ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজে ও স্বীয় পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' (আত-তাহরীম, ৬৬/৬)। তিনি আরো বলেন, 'সময়ের কসম! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা নয় যারা ঈমান আনয়ন করে, সৎ আমল করে, একে অপরকে হক্কের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যের উপদেশ দেয়' (আছর, ১০৩/১-৩)। এভাবে স্বামীকে বিনয়ের সাথে সৎ উপদেশ দিয়ে যেতে হবে। এ অবস্থায়ও তার হক্ক আদায়ের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। যেহেতু এখনো সে তার স্বামী। এরপরও যদি উপদেশ কোনো কাজে না আসে এবং সে আপন অবস্থায় অটল থাকে, তাহলে সে (স্ত্রী) চাইলে এ অবস্থায়ও তার সাথে সংসার করতে পারে বা চাইলে তার কাছে খুলা তালাক্ব নিতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, দুইজনে আল্লাহর সীমারেখাগুলো রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে উভয়ের কোনো গুনাহ হবে না স্ত্রী যার বিনিময়ে নিজকে মুক্ত করবে তার মাঝে' (আল-বাক্বারা, ২/২২৯)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ছাবেত ইবনু কায়েসের স্ত্রী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি ছাবেত ইবনু কায়েসের

আচার-আচরণের অভিযোগ করছি না; তবে আমি ইসলামের মধ্যে থেকে তার অবাধ্য হওয়া অপছন্দ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তাকে তার বাগান ফেরত দিতে চাচ্ছ? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ছাবেত! তুমি তোমার বাগান ফিরিয়ে নাও এবং তাকে এক তালাক্ব দাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭৩; ইবনু মাজাহ, হা/২০৫৬)। উল্লেখ্য যে, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি দ্বীন ইসলামের কোনো বিধানকে অস্বীকারবশত মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার সাথে ঘর সংসার করা কোনো মুসলিম নর-নারীর জন্য বৈধ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা (মুমিন নারী) তাদের জন্য (কাফেরদের জন্য) বৈধ হবে না এবং তারা কাফেররা মুমিন নারীদের জন্য হালাল হবে না' (মুমতাহিনা, ৬০/১১)। তিনি বলেন, 'তোমরা মেয়েদের মুশরিকের সাথে বিবাহ দিও না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে' (আল-বাক্বারা, ২/২২১)।

প্রশ্ন (৪) : আমি একজন ছহীহ আক্বীদার মেয়েকে বিবাহ করতে চাই। কিন্তু আমার এলাকার প্রায় ৯৫% দ্বীনদার লোকই কোনো না কোনো পীরের মুরিদ এবং তাদের আক্বীদা মারাত্মক। অন্যদিকে আমার অভিভাবকগণ অন্য এলাকায় বিয়ে দিতে রাজি না। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-মো. মিরাজুল ইসলাম
গলাচিপা, পটুয়াখালী

উত্তর : যদি পীর ও মুরিদদের আক্বীদা শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে এধরনের আক্বীদা পোষণকারী সমাজে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ছহীহ আক্বীদার কোনো দ্বীনদার সৎ মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। যদিও তা পরিবার থেকে দূরের কোনো এলাকায় হয়। এক্ষেত্রে পিতামাতার আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পিড়াপিড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নাই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না' (আল-আনকাবূত, ২৯/৮)। তবে পিতামাতাকে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। এজন্য তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নাওয়াস ইবনু সামআন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৯৫; মিশকাত, হা/৩৬৯৬)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৫) : আমার মাসিক অবস্থায় প্রথম দুই দিন রক্ত যায়, ৩য় দিন বন্ধ থাকে আবার ৪র্থ দিন কয়েক ফোঁটা নির্গত হয়, ৫ম দিন অনেক সময় বন্ধ থাকে আবার কখনো নির্গত হয়, ৬ষ্ঠ দিন আবার বন্ধ থাকে এবং সপ্তম দিন সাদা পানির মতো নির্গত হয়ে পিরিয়ড শেষ হয়। এই ক্ষেত্রে আমি কীভাবে ছালাত আদায় করব?

-ইফফাত আরা
সদর লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর

উত্তর : যদি হায়েযের স্বাভাবিক দিনগুলোতে লাগাতার দুইদিন রক্ত এসে তৃতীয় দিন রক্ত বন্ধ হয়ে যায় আবার চতুর্থ দিন রক্ত আসে এবং এভাবে চলতে থাকে, তাহলে রক্ত বন্ধ হওয়াকেও হায়েয হিসেবে ধরতে হবে। এটা বলা যাবে না যে, হায়েয শেষ হয়েছে বরং হায়েয শেষ হয়েছে কি-না তা নির্ভর করে পবিত্রতার চিহ্নের উপর। আর তা হলো- সাদা আঠাল পদার্থ যা মহিলারা চিনে থাকে। মহিলারা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট নেকড়া বা তুলায় ভর্তি থলে পাঠাত। তাতে হলুদ বর্ণের রক্ত লেগে থাকত। তারা তাতে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না তা জিজ্ঞাসা করত। তিনি বলতেন, তোমরা তাড়াহুড়া করো না, তাতে সাদা আঠাল পদার্থ না দেখা পর্যন্ত (অপেক্ষা করো)। তিনি এটা দ্বারা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া বোঝাতেন (ছহীহ বুখারী, ২/৫৮)। সুতরাং হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার মাপকাঠি হলো সাদা আঠাল পদার্থ যা হায়েযের শেষ দিকে নির্গত হয়ে থাকে। এর আগ পর্যন্ত হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। আর হায়েয অবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে না। আর তা দেখা গেলে গোসল করে পবিত্র হয়ে ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৬) : সন্তান প্রসবের আগে লেবার পেইন (প্রসব ব্যথা) উঠার সাথে সাথে তো সন্তান ভূমিষ্ট হয় না। এখন আমি জানতে চাই, এই এমনিউটিক ফ্লুইড (পানি) ভেঙ্গে যাওয়ার পর, বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত ছালাতের ওয়াক্ত হলে কি ছালাত আদায় করতে হবে নাকি ফ্লুইড ভেঙ্গে গেলে আর ছালাত আদায় করা লাগবে না?

-হাজেরা
ফ্রনটোন, ফ্রান্স

উত্তর : সন্তান ভূমিষ্টের পূর্বে গর্ভবতী মায়ের পেট থেকে যা কিছু নির্গত হয়, তার দুই অবস্থা- ১. যদি তা রক্ত হয় এবং সন্তান ভূমিষ্টের দুই তিন দিন পূর্বে প্রচণ্ড ব্যথার সাথে বের হয়, তাহলে তা নিফাসের রক্ত। এ অবস্থায় তাকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে না। আর তা না হলে তথা ব্যথার সাথে বের না হলে সেটা ইসতেহাযার রক্ত বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় সে ছালাত ছিয়াম আদায় করবে। ২. আর যদি শুধু পানি বের হয়, তাহলে সেটা স্বাভাবিক তরল পদার্থ হিসেবে ধরা হবে যা বের হলে অযূ নষ্ট হয়। এ অবস্থায়ও ছালাত ও

ছিয়াম আদায় করবে। কেননা তা নিফাসের রক্ত নয়। ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সন্তান ভূমিষ্টের দুইদিন বা তিনদিন পূর্বে যা দেখা যায় তা নিফাস হিসাবে গণ্য। কেননা তা সন্তান ভূমিষ্টের জন্যই বের হয়েছে (শরহু উমদাতিল ফিকহ, ১/৫১৪)।

ছালাত

প্রশ্ন (৭) : নিষিদ্ধ সময়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা যাবে কি? দলীল সহ জানতে চাই।

-মাহিফ
যশোর।

উত্তর : যেসময় ছালাত আদায় করতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন সেগুলো ছালাতের নিষিদ্ধ সময়। উকবা বিন আমের জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনটি সময়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ছালাত আদায় করতে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন- সূর্য উদয়ের সময়, যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উপরে উঠে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে থাকা অবস্থায়, যতক্ষণ না তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে। আর যখন সূর্য অস্ত যায়' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩)। এ সময়গুলোতে সাধারণ নফল ছালাত আদায় নিষিদ্ধ। কিন্তু যে সকল ছালাত বিশেষ কোনো 'কারণ' এর প্রেক্ষিতে পড়া হয়, সেগুলো উক্ত কারণ পাওয়ার সাথে সাথে নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যায়। বিলম্ব করার সুযোগ থাকে না। যেমন- তাহিয়্যাতুল অযূ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, ছালাতুল কুসূফ বা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ছালাত ইত্যাদি। কেননা বিলম্ব করলে উক্ত কারণগুলোর মূল্যায়ন থাকে না। নিষিদ্ধ সময় মসজিদে প্রবেশ করার কারণে কেউ যদি ১৫ মিনিট দেরি করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করে তাহলে শরীআতের বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে না। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে নেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪)।

প্রশ্ন (৮) : আমাদের এলাকার এক মসজিদের সভাপতি ছাহাবী মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কাফের বলে। মসজিদের ইমামও তাকে সমর্থন করে। তাদের ইমামতিতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-তারেক মাহমুদ
আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দেওয়া শিয়াদের আক্বীদা। এমন ইমামকে অপসারণ করা উচিত, যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন ছাহাবীগণ। পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করেও তাদের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয়। ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলের ছাহাবীদের একজনকে অভিশাপ দেয় যেমন, মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান এবং আমর ইবনে আস এবং তাদের মতো কাউকে, তারা কঠোর শাস্তির যোগ্য। বরং আলেমগণ মতভেদ করেছেন, তারা কি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য? নাকি তাদের হত্যার চেয়ে কম শাস্তি দেওয়া হবে? (মাজমাআ ফাতওয়া, ৩৫/৫৮)। ফাসেক ইমামের পিছনে ছালাত হয়ে যাবে। তবে সে যদি পাপের মাধ্যমে কুফরী করে তবে তার পিছনে ছালাত আদায় বৈধ হবে না (মাজমূ, ৪/১৫১)। কোনো ছাহাবীকে কাফের বলা বা তা সমর্থন করা নিঃসন্দেহে একটি কুফরী কাজ। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'কেউ তার ভাইকে কাফির বললে, তাদের দুজনের একজনের উপর তা বর্তাবে' (বুখারী, হা/৬১০৪)। এক্ষেত্রে আশেপাশের কোনো ছহীহ আক্বীদার মসজিদে ছালাত আদায় করা উচিত।

প্রশ্ন (৯) : ছালাত আদায়ের সময় টুপি না পরলে কি ছালাতের নেকী কম হবে?

-মুহাম্মাদ মুশাররফ শেখ
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

উত্তর : ছালাতের সময় উত্তম পোশাক পরার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে আদমের বংশধরগণ! প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। পানাহার করবে কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি পছন্দ করেন না অপব্যয়ীদের' (আ'রাফ, ৭/৩১)। পুরুষের জন্য ছালাতে টুপি, পাগড়ি পরা জরুরী নয়। এতে নেকী কম হবে না। তবে সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক হিসেবে টুপি, পাগড়ি ইত্যাদি দ্বারা মাথা ঢেকে সুন্দরভাবে বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর সামনে ছালাতে দণ্ডায়মান হওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ।

প্রশ্ন (১০) : আমাদের অফিসে ছালাত পড়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা না থাকার কারণে এবং মুছল্লী বেশি হওয়ায় মানুষজন জুতা-স্যান্ডেল পরে চলাচল করে এমন রাস্তায় জায়নামায বিছিয়ে জামাআত সহকারে ছালাত আদায় করি। এমন মানুষজন চলাচলের রাস্তায় ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মাসুদ রানা
সরিষাবাড়ী ,জামালপুর

উত্তর : ফরয ছালাত আদায়ের স্থান হলো মসজিদ এবং মসজিদে জামাআতের সাথে ছালাত আদায়ের বিশেষ গুরুত্ব ইসলামে রয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'একা ছালাতের চেয়ে জামাআতের ছালাতের মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৫)। কোনো কারণে মসজিদে ছালাত আদায় যদি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় সেক্ষেত্রে অন্যত্র ছালাত আদায় করা যায়। দুনিয়ার যেকোনো স্থানে ছালাত আদায় করা বৈধ। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন,

‘সারা পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ (ছালাতের জায়গা) এবং পবিত্রতার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে’ (বুখারী, হা/৪৩৮)। এমন জায়গায় ছালাত আদায়ে শারঈ কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (১১) : আমি রাফউল ইয়াদাইন করি এবং কখন করতে হয় সেটাও জানি। কিন্তু আমি যখন মাগরিবের ছালাতে জামাআতে ১ রাকআত বা ২ রাকআত মিস করি তখন রাফউল ইয়াদাইন করতে সমস্যা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মাগরিবে ইমাম এর ৩য় রাকাত আমার ১ম রাকাত। ইমাম সালাম ফিরাল কিন্তু আমি সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এখন কি আমি রাফউল ইয়াদাইন করব?

-জাকির
ঢাকা।

উত্তর : ছালাতে চার স্থানে রাফউল ইয়াদাইন করতে হয়- ১. তাকবীরে তাহরীমার সময়, ২. রুকূতে যাওয়ার সময়, ৩. রুকূ থেকে উঠার সময়, ৪. দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর সময়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু যখন ছালাতে প্রবেশ করতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং রাফউল ইয়াদাইন করতেন, যখন রুকূ করতেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন করতেন, যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলতেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন করতেন এবং যখন দুই রাকআত থেকে (দুই রাকআত শেষ করে তৃতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়াতেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৯)। এই হাদীছের আলোকে আপনাকে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে না। যেহেতু আপনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়েছেন।

প্রশ্ন (১২) : আমি বিতর ছালাত রাতে উঠে পড়ব বলে ঘুমিয়ে যায় কিন্তু রাতে উঠতে না পারায় আমার মাঝে মধ্যে বিতর ছালাত ছুটে যায়। এতে কি আমার গুনাহ হবে?

-রাজিয়া
তানোর, রাজশাহী

উত্তর : বিতর ছালাতের সঠিক সময় হলো ঘুমানোর পূর্বে বা ফজরের আযানের পূর্বে আদায় করা। তবে কারো যদি ঘুম, অসুস্থতা বা ভুলে যাওয়ার কারণে ছুটে যায় তাহলে যোহর ছালাতের পূর্বে আদায় করে নিবে। এ ক্ষেত্রে জোড় সংখ্যক করে বিতর ছালাত পড়তে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে যখন ঘুম, অসুস্থতা বা ব্যথা কিয়ামুল লাইল হতে ব্যস্ত রাখত তখন তিনি দিনের বেলায় ১২ রাকআত ছালাত আদায় করতেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৩১৪)। হাদীছে বুঝা যায় যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতর ছালাত দিনের বেলায় জোড়া করে পড়েছেন। তাই বিতর ছুটে গেলে দিনের বেলা জোড়া করে পড়তে হবে (মাজমাআ ফাতওয়া লি ইবনে উছায়মীন, ১৪/১১৪; মাজমু লি বিন বায, ১১/৩০৫-৩০৮)। কারো যদি এই বিতর ছালাত অসর্তকতাবশত ছুটে যায় তাহলে গুনাহগার হবে না। কারণ তা নফল ছালাত। তবে অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পালন করা হতে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৩)।

প্রশ্ন (১৩) : আমাদের মসজিদের দেয়ালে মক্কা কা‘বা ঘরের ছবি লাগানো আছে এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নাম ও আল্লাহর নাম দুইপাশে লাগানো আছে। এধরনের মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শুভ
বগুড়া

উত্তর : মসজিদের সামনে দেয়ালে মক্কা মদীনা বা কা‘বার ছবি অথবা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন ডিজিটাল ঘড়ি বা দু‘আ যিকিরের ক্যালেন্ডার ইত্যাদি রাখা যাবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করলেন। আর ছালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। ছালাত শেষে তিনি বললেন, ‘এ চাদরখানা আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও, আর তাঁর কাছ হতে আমবিজানিয়্যাহ (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে আস। এটা তো আমাকে ছালাত থেকে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৩)। প্রথমত, আমাদের করণীয় হবে মসজিদে ছবি টাঙ্গানোর মাধ্যমে চাকচিক্য করা হতে বিরত থাকা। দ্বিতীয়ত, একপাশে আল্লাহ এবং অপর পাশে মুহাম্মাদ এমনভাবে লিখা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে শিরক করা হয়। তবে কেউ যদি লিখতেই চাই তাহলে আল্লাহু আকবার লিখতে পারে। কারণ তাতে অর্থের কোনো বিকৃতি ঘটে না। এ ক্ষেত্রে বুঝানোর মাধ্যমে জিনিসগুলো অপসারণ করতে হবে। এতে যদি তারা রাজি না হয় তাহলে আপনার জন্য উত্তম হবে পাশের অন্য মসজিদে ছালাত পড়া। তবে উক্ত মসজিদে ছালাত পড়লে ছালাত হয়ে যাবে। ওয়াল্লাহু আ‘লাম। উল্লেখ্য যে, মানুষের নাম সুন্দর ও অর্থবহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রশ্নকারীর নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ রইল।

যাকাত

প্রশ্ন (১৪) : আমার বাবা ঋণগ্রস্ত। আমাদের ফসলের উশর বা যাকাত কি আমার ঋণগ্রস্ত বাবাকে দেওয়া যাবে?

-জুবায়ের আলম
দিনাজপুর।

উত্তর : পিতামাতার খাওয়া-দাওয়া, ব্যক্তিগত খরচ যাকাত থেকে দেওয়া যাবে না। যাদের ভরণপোষণ দেওয়া ব্যক্তির

উপর ওয়াজিব, তাদেরকে যাকাত-উশর দেওয়া যাবে না। যেহেতু পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততির ভরণপোষণ দেওয়া প্রত্যেকটি মানুষের জন্য জরুরী, তাই তাদেরকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয় (আল মুগনী, ২/২৬৯)। তবে ঋণগ্রস্ত পিতা-মাতাকে যাকাত দেওয়া বৈধ হবে, যদি তারা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়। কারণ পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য আবশ্যক নয়, সেজন্য তা যাকাত বা উশর থেকে দেওয়া যাবে। তাই ভরণপোষণ হিসেবে দিলে তা বৈধ হবে না। কারণ পিতামাতার যাবতীয় ভরণপোষণ সন্তানের উপর ওয়াজিব (মাজমূউল ফাতাওয়া, ১৪/৩১১)।

হাদীছ বিশ্লেষণ

প্রশ্ন (১৫) : নবী ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের আলামত হচ্ছে লোকেরা মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করবে কিন্তু তাতে দুই রাকআত ছালাত পড়বে না' হাদীছটি কি ছহীহ?

-গোলাম রাব্বি
বরিশাল।

উত্তর : উল্লিখিত হাদীছটি ছহীহ (সিলসিলা ছহীহা, হা/৬৪৯; শুআবুল ঈমান, হা/৮৭৭৯)।

প্রশ্ন (১৬) : 'সূরা ইখলাস ১০ বার পড়লে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হয়' উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মো. জাহিদ হাসান
মোহনপুর, রাজশাহী

উত্তর : হাদীছটির ইবারত নিম্নরূপ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشَرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ দশবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৬৪৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৮৯)। এই হাদীছটির সনদে রিশদীন ইবনু সা'দ ও যাববান এই দুই রাবী থাকার কারণে যঈফ। তবে ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি আমলযোগ্য বলেছেন। যেহেতু তার ত্বাবারানী, হা/৩৯৭ ও দারেমী, ২/৪৫৯-এ শাওয়াহেদ রয়েছে।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (১৭) : ব্যাংকিং সফটওয়্যার বানানো কি হালাল? আমার থেকে কেউ যদি তা ক্রয় করে বা আমি বানিয়ে দেওয়ার পর তারা সূদের সাথে সম্পৃক্ত হয় সেক্ষেত্রে কি আমার উপর এর দায়ভার বর্তাবে?

-আজহারউদ্দীন
ফেনী।

উত্তর : বর্তমানে সূদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান যদি হারামের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কথা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়, তাহলে তাদের কাছে সফটওয়্যার বিক্রি করা অন্যায়কে সাহায্য করার শামিল। মহান আল্লাহ অন্যায় কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন, 'আর তোমরা নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। পাপ ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। ভালো কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ যেমন আমলকারীর সমপরিমাণ নেকী পায়, তদ্রূপ মন্দ কাজে সহযোগিতা করার কারণে সমপরিমাণ পাপের ভাগিদার হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪; আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৯)।

প্রশ্ন (১৮) : ইউটিউবে বিভিন্ন জিনিস শিখিয়ে মনিটাইজেশন (বিজ্ঞাপন) দিয়ে উপার্জন হালাল না হারাম? জনৈক মুফতী ছাহেব এই উপার্জনকে হালাল বলেছেন। যেহেতু বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন আসে তাই তিনি বলেছেন উপার্জনের ১০% অর্থ ছাদাকা করে দিলে সেটা হালাল হয়ে যাবে।

-শেখ মনিরুল
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

উত্তর : ইউটিউবে মনিটাইজেশনের মাধ্যমে কৃত উপার্জন হালাল হতে পারে এই শর্তে যে, প্রদর্শিত বিজ্ঞাপন যেন হারাম থেকে মুক্ত হয়। অর্থাৎ মিউজিক, নারীদেহের প্রদর্শন, সূদ, মদ, যেকোনো হারাম, অশ্লীল অথবা মন্দের দিকে উদ্বুদ্ধকারী বিজ্ঞাপন না হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কোনো চ্যানেল মালিকের স্বাধীনতা থাকে না। বরং ইউটিউব কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছামতো বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে থাকে। ইসলামে হালাল ও হারাম স্পষ্ট। রাসূল ﷺ বলেন, 'নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে' (বুখারী, হা/৫২; মুসলিম, হা/৩৯৮৬)। তাই এর ইনকাম থেকে বিরত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'পবিত্র ও নিকৃষ্ট কখনো সমান হতে পারে না- যদি নিকৃষ্টের আধিক্য তোমাকে আকৃষ্ট করে। অতএব হে বিবেকবান লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে' (আল মায়েদা, ৫/১০০)।

প্রশ্ন (১৯) : আমি একটি গ্রুপ অব কোম্পানিতে চাকরি করি। এমন কোম্পানিগুলো সাধারণত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হালাল-হারাম সব ধরনের ব্যবসা করে। আমি উক্ত কোম্পানির ফরেন পারচেজ করি এবং সকল আইটি সাপোর্ট দিয়ে থাকি। আমার এই চাকরি সম্পূর্ণ হালাল হচ্ছে কি-না বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

-শাহিন আলম
বগুড়া।

উত্তর : কোম্পানির অর্থ-সম্পত্তি যদি পরিপূর্ণ সূদী লোন হয় তাহলে সেখানে যেকোনো পদে চাকরি করা হারাম। আর কোম্পানির অর্থ-সম্পত্তির কিছু অংশ সূদ থেকে আসে এবং বড় একটা অংশ হালাল উৎস থেকে আসে, সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির মৌলিক কাজ যদি হারাম না হয় এবং আপনি যে দায়িত্বে আছেন তা হারাম সংশ্লিষ্ট কিছু না হয়, তাহলে চাকরি করা যেতে পারে। তবে চেষ্টা করতে হবে যেকোনো ভাবে হারামের সাথে সম্পৃক্ত কোম্পানির কোনো পদে চাকরি না করা। কেননা এর মাধ্যমে হারাম কাজে সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা নেকী ও পরহেযগারিতায় একে অন্যের সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না, আর আল্লাহকে ভয় করো’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। সুতরাং হারামের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানিতে চাকরি করলে অনতিবিলম্বে তা ছেড়ে দিয়ে হালাল মাধ্যমে রূযী অন্বেষণ করা উচিত।

প্রশ্ন (২০) : আমি একটি শোরুমে চাকরি করি। আমাদের শোরুম খোলার অফিসিয়ালি সময় সকাল ১০.৩০ টায়। কিন্তু শোরুমের ম্যানেজার দেরিতে খোলে। যার ফলে আমিও তার সাথে দেরিতে শোরুমে যাই। এক্ষেত্রে আমার বেতন কি হালাল হবে?

-রায়হান
টঙ্গি, গাজীপুর

উত্তর : না, এটা হালাল হবে না। কেননা, এটা আমানতের পরিপন্থী কাজ। নির্দিষ্ট সময়েই শোরুমে উপস্থিত হতে হবে। নচেৎ জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। কেননা দুনিয়ার প্রতিটি সেক্টরে যে মানুষ যে কাজের দায়িত্বশীল সে সে কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জেনে রেখো! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল, তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৪৯৫; মিশকাত, হা/৩৬৮৫)। ফাঁকি দেয়া উম্মতে মুহাম্মাদীর কাজ নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’ (ছহীহ মুসলিম, ১/৯৮; ইবনু মাজাহ, হা/২২২৫)।

প্রশ্ন (২১) : ২৩ বছরের এক মুসলিম ছেলে এইচএসসি পাশ করেছে। তার বাবা আয়কর অফিসে চাকরি করে এবং বিভিন্ন সূদ ও ঘুষের সাথে সম্পৃক্ত। তার বাবা এখন ছেলেকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে চায়। এখন সেই ছেলে বাবার কথা শুনবে, নাকি চাকরি করে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে বাবার টাকা থেকে দূরে থাকবে?

-রিয়াজ আহমাদ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বাবার টাকায় লেখাপড়া করবে এবং খাবে। কেননা এ টাকা বাবার জন্য হারাম ছেলের জন্য হালাল। আনাস ইবনু মালেক বলেন, বারীরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু গোশত দিলেন যা তাকে ছাদাক্বা দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, ‘এটা তার জন্য ছাদাক্বা আর আমার জন্য হাদিয়া’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৩৬)। অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন হলে হুকুম পরিবর্তন হয়। আর বাবা যে পথেই ইনকাম করুক না কেন তার দায় তার উপরই বর্তাবে। পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর বর্তাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘কেউ কারো গুনাহের বোঝা বহন করবে না’ (আনআম, ৬/১৬৪)। তবে ছেলের কর্তব্য হলো পিতাকে উপদেশ দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা পরস্পর সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করো; পাপ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

বৈধ-অবৈধ

প্রশ্ন (২২) : যদি কেউ আল্লাহর ইবাদত করার পাশাপাশি অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। তাহলে কি তার ইবাদত কবুল হবে?

-মো. হাবিবুর রহমান
জয়পুরহাট

উত্তর : অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকা একটি জঘন্য কাজ ও কাবিরা গুনাহ। ইবাদত কবুলের মধ্যে পাপ কাজ থেকে মুক্ত থাকাকে শর্ত করা হয়নি। ইবাদত কবুলের শর্ত দুইটি- ১. নিয়তে একনিষ্ঠতা ও ২. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ। তাই বাহ্যিকভাবে তার ইবাদত ছহীহ হয়ে যাবে। তবে তার পাপের কারণে সে গুনাহগার হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে আর মুমিন থাকে না’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৭৫)। অন্য হাদীছে তিনি বলেছেন, ‘বান্দা যখন যেনা করে তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে তার মাথার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এরপর যখন সে তা ত্যাগ করে তখন পুনরায় তার কাছে ঈমান ফিরে আসে’ (তিরমিযী, হা/২৬২৫)।

প্রশ্ন (২৩) : শখ করে ছবি উঠিয়ে মোবাইলে রাখলে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করলে কি কোনো গুনাহ হবে?

-মো: আব্দুল্লাহ
সৈয়দপুর, নীলফামারী

উত্তর : ছবি অঙ্কন করা শরীআতে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের সবচেয়ে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে চিত্র অঙ্কনকারীরা' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৯)। বর্তমান যুগের প্রিন্ট মেশিনের সাহায্যে ছবি প্রিন্ট করে রাখাও ছবি অঙ্কনের শামিল। কিন্তু মোবাইল বা ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবিগুলো প্রিন্টেড ছবির মতো নয়। স্ক্রিন বন্ধ করে দিলেই তার অস্তিত্ব থাকে না (ইসলাম সওয়াল ওয়া জওয়াব, প্রশ্ন নং ৯১৩৫৬)। তবে তাক্বওয়াশীল মুমিনের জন্য বিনা প্রয়োজনে ছবি না তোলাই উচিত। ছবি তোলা এবং শেয়ার করার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রাইভেসি নষ্ট হয়। যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে এবং মানুষকে লোক দেখানোর একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত করে। যা এক প্রকার মানসিক রোগ। এই মানসিক রোগের ব্যাপকতার কারণে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। সুতরাং প্রয়োজন ছাড়া ছবি উঠানো এবং শেয়ার করা কখনোই তাক্বওয়াবান মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।

প্রশ্ন (২৪) : আমাদের বাজারে যে হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলের গোশতের দোকান আছে সেখানে যারা এসব যবেহ করে তাদের অধিকাংশই ছালাত আদায় বা ধর্মীয় অন্যান্য বিষয় মেনে চলে না। এক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে গোশত ক্রয় করা যাবে কি?

-আবূ আব্দুল্লাহ
কুচপাড়া, রাজশাহী

উত্তর : এই ধরনের একটি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ছালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত থেকে গাফেল থাকা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যারা আল্লাহকে ইলাহ এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা সকলেই মুসলিম। সৎকর্ম ত্যাগ করা কিংবা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তি দ্বীন থেকে খারিজ হয় না, তবে ফাসিক হয় (আল-হুজুরাত, ৪৯/৯, ১০, ১৬)। তার ঈমানও কমে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭)। তাই ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি ফাসিক অর্থাৎ পাপাচারী। কিন্তু তার যবেহকৃত প্রাণী হারাম নয় যদি সে বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে। তবে তাক্বওয়ার দাবি হলো, ছালাত আদায় করে এমন ব্যক্তির দোকান থেকে মুরগি ক্রয় করা এবং যবেহ করিয়ে নেওয়া। অন্যথায় নিজে যবেহ করে নেওয়া। অনেক উলামায়ে কেরাম ছালাত পরিত্যাগকারীদের যবেহকে হারাম বলেছেন (ইবনে উছাইমীন)। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন (২৫) : ভবিষ্যতের জন্য সেভিংস একাউন্টে টাকা জমা করা যাবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
পাবনা।

উত্তর : ব্যাংকে টাকা জমা রাখার মাধ্যমে যদি সেখান থেকে সূদ আসে তাহলে টাকা জমা রাখা যাবে না। সেটা যেকোনো ধরনের একাউন্ট হোক না কেন। তবে একাউন্ট যদি সূদমুক্ত করা হয় এবং সেখান থেকে ব্যক্তি কোনো লভ্যাংশ গ্রহণ না করে তাহলে টাকা জমা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, জমি এবং স্বর্ণ এমন দুটি বস্তু যা কিনে রাখলে মূল্যস্ফীতির মাধ্যমে মানুষের টাকা কমার আশংকা থাকে না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন' (আল বাকারা, ২/২৭৫)।

প্রশ্ন (২৬) : যুক্তি শেখার জন্য বিভিন্ন যুক্তিবিদ্যার বই পড়া কি জায়েয?

-নাহিদুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : যুক্তিবিদ্যা দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগী ও স্বতন্ত্র একটি বিষয়। যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃত বাস্তবতা, দলীলসমূহের বিভিন্ন দিক, শর্ত, সীমারেখা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় (রদ্দুল মুখতার, ৪৩/১)। যুক্তিবিদ্যা যদি শরীআতের বিষয়াদি বুঝতে সহযোগী হয়, ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত বিশ্বাস না থাকে এবং বাতিল দলসমূহের বিভিন্ন সংশয় দূর করতে সক্ষম হয় তবে শরীআত শিক্ষার মতো তা শিক্ষা করাও উচিত (মুগনীউল মুহতাজ, ৬/৯)। তবে যুক্তিবিদ্যার যেসমস্ত বইয়ে দার্শনিকদের বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ঘটেছে সেসমস্ত বইয়ের শিক্ষা অর্জন থেকে নিজেকে দূরে থাকতে হবে ও জাতিকেও সতর্ক করতে হবে।

প্রশ্ন (২৭) : জনৈক ব্যক্তি মসজিদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জমি দানের নিয়ত করে। কোনো কারণে এখন সে মনে করছে ঐ জমি বিক্রি করে দিবে এবং এর অর্থ দিয়ে অন্য জায়গাতে জমি কিনে দিবে অথবা সমপরিমাণ অর্থ অন্য মসজিদে নির্মাণ কাজে দান করবে। শরীআতের দৃষ্টিতে তার কী করা উচিত?

-আব্দুল্লাহ
শাহমখদুম, রাজশাহী

উত্তর : মসজিদের জন্য জমি দান নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ। ভালো কাজের নিয়ত করার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে

ছওয়াব দিয়ে থাকেন। নিয়ত করে জমি ওয়াকফ করা বা নিয়ত কার্যকর করা পর্যন্ত তা পরিবর্তন করা যায়। তবে যদি কেউ নির্দিষ্ট কোনো কাজের নযর (মানত) মেনে থাকে তাহলে তা পূরণ করতে হবে। দানকৃত সম্পদ হস্তান্তর করার পূর্বে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে (ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১৮৭; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা, ২/২৯৮)। তবে হস্তান্তর হয়ে গেলে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে না (ফাতহুল বারী, ৫/২৩৫)।

প্রশ্ন (২৮) : আমাদের সমাজের মসজিদে অর্থ না থাকায়, ইমাম মুয়াযযিনের বেতন বাবদ সমাজের লোকদের থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এতে কিছু বেনামাযী ও মসজিদে ছালাত আদায় করতে আসে না এমন লোক চাঁদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে একঘরে করে দেওয়াসহ বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা হয়। এটা কি জায়েয?

-মো. সেকেন্দার আলী
বাগমারা, রাজশাহী

উত্তর : যাকাত ব্যতীত ঐচ্ছিক দানের ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করা জায়েয নেই। কারো সম্পদ ভক্ষণ করা বা ব্যবহার করা তার মনসম্মতি ছাড়া বৈধ হবে না। আবূ হুরায়রা আর-রাক্বাশী তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘খরবদার! তোমরা যুলম করো না। খবরদার জেনে রেখো, কোনো ব্যক্তির সম্পদ তার সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করা বৈধ হবে না’ (মুসনাদে আহামদ, হা/২১১১৯; মিশকাত, হা/২৯৪৬)। কারো থেকে জোরপূর্বক তার অসম্মতিতে সম্পদ নিয়ে নেওয়াকে ছিনতাই বলে। ছিনতাইয়ের মাল বা লোকলজ্জার ভয়ে যদি কেউ সম্পদ দান করে (আসলে দান করার ইচ্ছা ছিল না) তাহলে এ ধরনের সম্পদ ব্যবহার করা বৈধ হবে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী ﷺ যে ঐতিহাসিক বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার একটি অংশ হলো, ‘তোমাদের রক্ত, সম্পদ, ও সম্মানহানি করা তোমাদের জন্য হারাম’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০৯; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭৪)। তবে মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজ ছাড়া একাকি জীবন যাপন করতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজনে সমাজ নেতা সমাজের মানুষের কাছে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা চাইলে তাতে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসা ঐ সমাজে বসবাসরত সকল সদস্যের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমাংলঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (২৯) : কারো মাধ্যমে সালাম আদান-প্রদানের বিধান কী?

-সিয়াম
জয়পুরহাট।

উত্তর : কেউ করো মাধ্যমে কারো নিকট সালাম পাঠাতে চাইলে সালাম পাঠাতে পারে। ইসলামী শরীআতে এটা জায়েয। গালেব বলেন, আমরা হাসান বাছরীর দরজার নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ একজন লোক এসে বলল, আমার পিতা আমার নিকট আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তাঁর কাছে যাও। গিয়ে আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানাবে। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلَامُ *‘আলায়কা ওয়া আলা আবি কাস- সালাম’* অর্থাৎ তোমার উপর ও তোমার পিতার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক! (আবূ দাঊদ, হা/৫২৩১; মিশকাত, হা/৪৬৫৫)। এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, কারো মাধ্যমে কারো নিকট সালাম প্রেরণ করা যায়। আর এর পদ্ধতি হলো যার মাধ্যমে সালাম পাঠানো হচ্ছে সে বলবে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তখন যাকে সালাম প্রদান করা হয়েছে সে সালামের উত্তর উল্লিখিত বাক্য দ্বারা প্রদান করবে।

প্রশ্ন (৩০) : নিরুপায় হয়ে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ছাত্র অবস্থায় বিয়ে করে ছেলে মেয়ের বাবার খরচে লেখাপড়া করবে এবং ছেলের চাকরি বা জীবিকার ব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বাবার দায়িত্বে থাকবে, এমন শর্তে বিয়ে করা বৈধ হবে কি?

-আবূ সাঈদ,
রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

উত্তর : না, এমন শর্তে বিয়ে করা বৈধ হবে না। কেননা তা যৌতুকেরই একটি শাখা, যা সম্পূর্ণ হারাম। মহান বলেন, ‘তোমরা একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না’ (আল-বাক্বারা, ২/১৮৮)। আমর ইবনু আউফ আল-মুযানী, তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘মুসলিমদের মাঝে সন্ধি করা জায়েয। তবে যে চুক্তি হালালকে হারাম করে হারামকে হালাল করে তা জায়েয নাই। মুসলিমরা তাদের শর্তের উপর অটল থাকতে বাধ্য। তবে সে শর্তের উপর নয় যা হালালকে হারাম করে হারামকে হালাম করে’ (তিরমিযী, হা/১৩৫২; ইবনু মাজাহ, হা/২৩৫৩)। শর্ত ছাড়া সহযোগিতা করতে পারে। বরং কারো বোঝা না হয়ে সামর্থ্য না থাকলে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য নববী পদ্ধতি গ্রহণ করে

ছিয়াম রাখা উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সামর্থ্য (আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য) রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে সংযত রাখে, লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না, তাকে ছিয়াম রাখতে হবে। কেননা তা তার জন্য যৌন উত্তেজনা দমনকারী’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০০; মিশকাত, হা/৩০৮০)।

প্রশ্ন (৩১) : ইসলামে দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে দাসী কারা? বর্তমানে কি দাস প্রথা বিদ্যমান আছে?

-শাহরিয়ার
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : শরীআত সম্মতভাবে দারুল কুফর বা দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করার পর যুদ্ধে যে সকল নারী ও শিশু বন্দি হয় সে সকল নারী-পুরুষদের দাস-দাসী বলা হয়। বনু কুরায়যার যুদ্ধে সা'দের ফায়সালায় পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিল এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দি করা হয়েছিল (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৩৪০)। ইসলামে দাস-দাসীর হুকুম এখনো বিদ্যমান রয়েছে; রহিত হয়নি। তবে বর্তমানে দাসদাসী নেই। ভবিষ্যতে যদি মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের যুদ্ধ হয় এবং এ যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী, তাহলে তারা তাদের মহিলা ও শিশুদের দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তবে তারা তাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে অথবা তাদের অধীনস্থ দাসীদের ক্ষেত্রে নিন্দিত হবে না’ (মুমিনূন, ২৩/৫-৬)। উল্লেখ্য যে, কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রয় করা বা অন্য কোনো মাধ্যমে দাস বানানো বৈধ নয়। কাজের মহিলারা দাসী নয়।

প্রশ্ন (৩২) : বিয়ের পরে নিয়মিত চুড়ি, নাকফুল, কানের দুল ইত্যাদি পরার বিষয়ে ইসলাম কী বলে?

-আব্দুল্লাহিল বাকী
মুর্শিদাবাদ, ভারত

উত্তর : বিয়ের পরে বা আগে যে কোনো সময় মেয়েরা চুড়ি, নাকফুল, কানের দুল ইত্যাদি পরতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার হাতে স্বর্ণের দুইটি চুড়ি দেখে বলেন, ‘তুমি কি এর যাকাত আদায় করেছ? এতে সে বলে, না। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তুমি কি এতে খুশি হবে যে, এর কারণে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের দুইটি চুড়ি পরিধান করাবেন? (একথা শুনে) সে তা খুলে ফেলে বলে, এগুলো আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (নাসাঈ, হা/২৪৭৯)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন নারীদের দান করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, এমনকি তাদের গলার হার দিয়ে হলেও। তখন তারা নিজেদের কানের দুল ও আংটি খুলে দান করতে থাকেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৫)। এই দুইটি হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, চুড়ি, নাকফুল, কানের দুল ইত্যাদি পরতে পারে। তবে বিধর্মীরা নাকফুলকে স্বামীর মঙ্গল কামনার নিদর্শন মনে করে এবং নাকফুল ও চুড়ি পরলে স্বামীর আয়ু কমে যায় না, এমন বিশ্বাস লালন করে। এমন বিশ্বাস সম্পূর্ণ কুসংস্কার ও শিরক। উল্লেখ্য, অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা মাহরাম ব্যতীত কারো কাছে প্রকাশ করা যাবে না।

ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন (৩৩) : ফরেক্স ট্রেডিং কি বৈধ?

-সুবহা বিনতে সবুজ
শ্রীপুর, গাজীপুর।

উত্তর : ফরেক্স মানে হলো foreign exchange market যাকে আবার FX market বলা হয়ে থাকে। ফরেক্স হলো এমন একটি মার্কেট যেখানে বিদেশী মুদ্রা (foreign currency) লেনদেন বা আদান প্রদান (exchange) করা হয়। যেহেতু ফরেক্সে এক মুদ্রার বিপরীতে অন্য মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় হয় তাই তা বৈধ। তবে কয়েকটি শর্ত মেনে ব্যবসাটি করতে হবে- (ক) সূদমুক্ত ইন্টারেস্ট ফ্রি একাউন্ট দিয়ে ট্রেড করতে হবে। (খ) বিপরীত জাতীয় মুদ্রার ট্রেডে লাভ করতে হবে। একই জাতীয় মুদ্রার ট্রেডে কম-বেশি করা যাবে না। যেমন, ডলারের বিপরীতে ডলার বিক্রি করে লাভ করলে তা হারাম হবে। ডলারের বিপরীতে টাকা বা টাকার বিপরীতে রিয়াল। এমন ভিন্ন মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ করা জায়েয। (গ) নগদ হাতে হাতে ক্রয় বিক্রয় করতে হবে। বাকীতে মুদ্রার বিনিময় হলে তা সূদ হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নগদ হাতে হাতে লেনদেন ছাড়া সোনার বদলে সোনা বিক্রি, গমের বদলে গম বিক্রি, খেজুরের বদলে খেজুর বিক্রি, যবের বদলে যব বিক্রি করা সূদ হিসাবে গণ্য’ (বুখারী, হা/২১৩৪)। তিনি আরও বলেন, ‘গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব সমপরিমাণ হতে হবে। কিন্তু যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে যব অধিক হলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে, বাকীতে বিক্রয় করা চলবে না’ (নাসাঈ, হা/৪৫৬৩)।

প্রশ্ন (৩৪) : মহিলাদের শাড়ি, হাফ হাতা ব্লাউজ, মেয়েদের থ্রি পিস, হাফ হাতা বা ফুল হাতা, বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ, বিভিন্ন রং এর প্রিন্ট, বিভিন্ন স্টাইলের জামা ইত্যাদি বানানো ও বিক্রয় করা যাবে কি?

-মো. আবূ মূসা
লোহাগড়া, নড়াইল

উত্তর : নারীদের ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় পোশাক তৈরি করা, হাতের কাজ করা কিংবা বিক্রয় করা জায়েয। সেটা যে ধরনের পোশাকই হোক না কেন। শর্ত হলো, ১. সেটা যেন পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়। রাসূল ﷺ বলেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে যাবে না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, (২) যে ব্যক্তি তার পরিবারে বেহায়াপনার সুযোগ দেয়, (৩) পুরুষের বেশধারী নারী' (শুআবুল ঈমান, হা/১০৩১০; ছহীহ তারগীব, হা/২০৭০)। ২. আঁটসাঁট না হয়; এবং ৩. এমন পাতলা ঝরঝরে না হয়, যার উপর দিয়ে ভিতরের অঙ্গ দেখা যায়। نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ অর্থাৎ কাপড় পরিহিত উলঙ্গ নারী (মুসলিম হা/৫৪৭৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬৬৫)। দর্জি যদি পুরুষ হয় তাহলে নারীদের পোশাকের মাপ নিজে না নিয়ে অন্য মহিলার মাধ্যমে নিবে।

প্রশ্ন (৩৫) : একই জিনিস নগদে ৫০ টাকায় এবং ধারে ৬০ টাকায় বিক্রি করা বৈধ কি?

-সেলিম
খুলনা সদর।

উত্তর: এক কিস্তিতেই হোক বা একাধিক নির্দিষ্ট কিস্তিতে হোক চুক্তি করে বেশি নেওয়া দোষাবহ নয়। যেমন, যদি কোনো দোকানদার ১ কেজি সরিষার তেল নগদ দরে ৫০ টাকা এবং ধারে ৬০ টাকা হিসাবে বিক্রয় করে, আর ক্রেতাও এ চুক্তিতে রাজি হয়ে ক্রয় করে থাকে, তাহলে উভয়ের জন্য তা বৈধ। এরূপ লেনদেন ব্যবসা চুক্তি সূদের পর্যায়ভূক্ত নয়। ইক্বরিমা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এমন চুক্তিতে কোনো সমস্যা নেই যে, নগদ মূল্যে এত আর বাকি মূল্যে এত (মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা, হা/২০৮২৬, ২০৮২৭)।

মৃত্যু-কবর

প্রশ্ন (৩৬) : আমার বাড়ির গেটে কবর আছে, কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় তা জানি না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? আমি কি ঐদিক দিয়ে চলাচল করতে পারব?

-মাহমুদ হাসান মাহি
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম

উত্তর : কবরের জায়গাটা যদি নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায়, তাহলে মুসলিম ব্যক্তির লাশের সম্মানার্থে সেই জায়গা থেকে গেট সরিয়ে ফেলতে হবে। তবে কবর যদি দীর্ঘ দিনের পুরনো হয় এবং হাড়-হাড্ডি পচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে গেট নির্মাণ করা কিংবা সেখান দিয়ে চলাফেরা করাতে কোনো অসুবিধা নেই (আল মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব, ৫/৩০৩)। আবূ মারসাদ আল-গানাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করবে না' (আবূ দাঊদ, হা/৩২২৯)।

প্রশ্ন (৩৭) : পুরাতন কবরের উপর ঘরবাড়ি করা যাবে কি?

-আহমাদ আলী
দুবাই।

উত্তর : কবরের উপর ঘর তৈরি করে বসবাস করা নাজায়েয ও নিন্দনীয় কাজ। এ কাজের দ্বারা কবরবাসীকে অপমান করা হয়। এমনকি কবরের উপর বসাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত পড়বে না এবং কবরের উপর বসবে না' (মুসলিম, হা/২১২২)। ইবনু তায়মিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কবরের উপর মসজিদ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধ করে গিয়েছেন (মাজমূআ ফাতাওয়া লি ইবনে তাইমিয়াহ, ২২/১৯৪-৯৫)। তবে যদি একান্ত কোনো কারণে বাড়িঘর করতে হয় আর কবর অল্প পুরোনো বা নতুন হয় তাহলে লাশ উঠিয়ে অন্যত্র কবর স্থানান্তর করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি কবর অনেক পুরাতন হয় তাহলে সেখানে মাটির নিচে পুঁতে রেখে সমান করার মাধ্যমে কবর মিটিয়ে দিয়ে উপরে বাড়ি নির্মাণ করতে হবে (ফাতহুল কাদীর, ২/১০১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ২/৪৭; মাজমূআ ফাতাওয়া, ৩/৩০৩)।

প্রশ্ন (৩৮) : কবরস্থান যিয়ারত করা ও সেখানে দুই হাত তুলে দু'আ করার বিধান কী? এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সম্মিলিত মুনাজাত করা যাবে কি?

-মো. মুখলেসুর রহমান
গোদাগাড়ী, রাজশাহী

উত্তর : কবরস্থান যিয়ারত করা বৈধ। কেননা তা আখেরাতের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা তা দুনিয়া বিমুখ করে এবং আখেরাতের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭)। করবস্থানে পরিবারকে নিয়ে সম্মিলিভাবে হাত তুলে দু'আ

করা বিদ'আত। তবে একাকী যিয়ারত করতে গিয়ে হাত তুলে দু'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে রাত্রিযাপন কালে বাক্বিউল গারকাদ করবস্থানে রাত্রি বেলায় চুপিসারে গিয়ে একাকী হাত তুলে দু'আ করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৪; নাসাঈ, হা/২০৩৭)।

প্রশ্ন (৩৯) : কেউ যদি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে যায় যে, আমার মৃত্যুর পর অমুক ব্যক্তি আমাকে মাটি দিতে পারবে না, তাহলে কি তার এই অছিয়ত পূর্ণ করা যাবে?

-মাসুদ রানা
সরিষাবাড়ি, জামালপুর

উত্তর : না, তার এ অছিয়ত পূর্ণ করা যাবে না। এ ধরনের অছিয়ত বৈধ হবে না। কারণ এটা শরীআত পরিপন্থী কাজ। আর মৃতপ্রায় ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে না এ ধরনের অছিয়ত করা। ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এতে কোনো দ্বিমত নাই যে, কেউ শরীআত বিরোধী অছিয়ত করলে তার সে অছিয়ত পূর্ণ করা বৈধ হবে না। যেমন- মদ্যপান করা, শুকরের গোশত খাওয়া অথবা অন্য কোনো গুনাহের কাজের অছিয়ত করা যেমনটি এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদের অছিয়ত পূর্ণ করা বৈধ নয় (তাফসীরে কুরতুবী, ২/২৯৬)। তাছাড়া এখানে একজন মুসলিম ব্যক্তিকে তার জানাযার ছালাতে শরীক হতে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে ও নেকী থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ সবকিছু নিষিদ্ধ কাজ।

প্রশ্ন (৪০) : গ্রামের কিছু এলাকায় দেখা যায় এবং তারা বলে থাকে, শনিবার ও মঙ্গলবার কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার কবর পাহারা দিতে হয়- কুরআন বা ছহীহ হাদীছে এর কোনো সত্যতা আছে কি?

-নাসিরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : শনিবার ও মঙ্গলবার কেউ মারা গেলে তার লাশ পাহারা দেওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোনো কথা বর্ণিত হয়নি। এগুলো সামাজিক কুসংস্কার। তবে লাশ চুরি হওয়া বা লাশের সাথে কোনো ধরনের অমানবিক আচরণের সম্ভাবনা থাকলে পাহারা দিলে দিতে পারে (মাজমূ লি মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম, ৩/২০০)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা যেমন মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গাও তেমন' (আবূ দাঊদ, হা/৩২০৭; মিশকাত, হা/১৭১৪)।

প্রশ্ন (৪১) : পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জানাজা ও কবরস্থ করাসহ অন্যান্য পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানতে চাই।

-আল মারুফ হোসেন ফয়সাল
রংপুর সদর, রংপুর।

উত্তর : পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ছেলেদের উপর কিছু করণীয় থাকে। যা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলো- (১) কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। (২) ঋণ পরিশোধ করা (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৫২)। (৩) মৃত ব্যক্তি উত্তরাধিকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য অছিয়ত করে গেলে তা বাস্তবায়ন করা। তবে তা সমস্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হওয়া যাবে না (ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৫)। (৪) মৃত ব্যক্তির সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া (আন-নিসা, ৪/১১)। (৫) সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার জন্য দু'আ করা এবং দান-ছাদাক্বা করা (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩১০)। (৬) পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভালো ব্যবহার, আচরণ করা ইত্যাদি।

কসম-নযর

প্রশ্ন (৪২) : আমি একবার আল্লাহর নামে কসম করি তারপর ভুলবশত তা ভেঙে ফেলি। এখন কি কসম পূরণ করা লাগবে নাকি তওবাই যথেষ্ট? নাকি কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে?

-ফাইয়াজ খান
চাঁদপুর।

উত্তর : কসমের মাধ্যমে কোনো কাজ করা বা না করার বিষয়টি নিজের উপর আবশ্যক হয়ে যায়। কসম করার পর কোনো কারণে সেই কাজের তুলনায় অন্য কাজ উত্তম মনে হলে কসম থেকে ফিরে আসা যায় এবং এর জন্য সেই ব্যক্তিকে কাফফারা দিতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি কসম করে, তারপর অন্যটি তার চেয়ে উত্তম মনে করে তবে সে যেন উত্তম কাজটি করে এবং কসমের কাফফারা দিয়ে দেয়' (মুসলিম, হা/১৬৫০)। কসমের কাফফারার ক্ষেত্রে তিনটি কাজের যেকোনো একটির মাধ্যমে তা আদায় করা যায়। ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়ানো বা কাপড় দেওয়া অথবা দাস মুক্ত করা। খাদ্য দিলে মিসকীন প্রতি অর্ধ সা (সোয়া এক কেজি) খাদ্য দিতে হবে। এগুলোর কোনো একটি আদায়ের সামর্থ্য না থাকলে তিন দিন ছিয়াম রাখতে হবে (আল মায়েদা, ৫/৮৯) যেহেতু কসম ভঙ্গ করা হয়েছে সুতরাং তিনটির যেকোনো একটির মাধ্যমে কাফফারা দিতে হবে।

প্রশ্ন (৪৩) : আমার মা কুরআন মাজীদ শেখার সময় মানত করেছিল যে, শিখতে পারলে জীবনভর জুমআর দিন ছিয়াম রাখবে। আগে ছিয়াম রাখত। কিন্তু এখন অসুস্থতার জন্য পারে না। এখন করণীয় কী?

-সুমাইয়া
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এ মানত হাদীছ বিরোধী। সুতরাং নযর পূর্ণ করা যাবে না এবং শুধু জুমআর দিন ছিয়াম রাখা যাবে না। কেননা শুধু জুমআর দিন ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ। মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ বলেন, আমি জাবেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমআর দিন ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮৪)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কেউ যেন জুমআর দিন ছিয়াম না রাখে। কিন্তু যদি এর সাথে আগে বা পরে একদিন রাখলে রাখতে পারে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৪)। উক্ববা ইবনু আমের থেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানতের কাফফারা হলো কসম ভঙ্গের কাফফারা' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৫; আবূ দাঊদ, হা/৩৩২৩)। আর কসম ভঙ্গের কাফফারা হলো, মহান আল্লাহ বলেন, 'কসম ভঙ্গের কাফফারা হলো দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাওয়াও অথবা তাদের কাপড় পরানো অথবা একটি গোলাম আযাদ করা, এগুলোর কোনো একটি করতে না পারলে লাগাতার তিন দিন ছিয়াম পালন করা (আল-মায়েদা, ৫/৮৯)।

আক্বীক্বা

প্রশ্ন (৪৪) : আমার বাবা-মার অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আমার ও আমার ভাই-বোনদের আক্বীক্বা দিতে পারেননি। তারা কি এখন আক্বীক্বা করতে পারবেন? আর না করা গেলে কোনো করণীয় আছে কি?

-আরিফ বিন সাঈদ
সোনাতলা, বগুড়া

উত্তর : সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো পশু যবেহ করে আক্বীক্বা করা। রাসূল ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার বিনিময়ে দায়বদ্ধ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে যবেহ করবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করে নাম রাখবে' (সুনানে আবূ দাঊদ, ২/৩৯২)। বিষয়টি নিয়ে মতভেদ থাকলেও সঠিক মতামত হলো, যদি কেউ সপ্তম দিনে কোনো কারণে আক্বীক্বা দিতে অক্ষম হয় তাহলে সন্তান বালেগ হওয়ার পর পিতা-মাতা আক্বীক্বা করতে পারবে না (মাজমূ, ৮/৪৩১)।

আমল-আখলাক

প্রশ্ন (৪৫) : এমন কোনো দু'আ, সূরা বা আয়াত আছে কি যা পাঠ করলে পুলসিরাত পার হওয়া যাবে হাশরের মাঠে, মিযানের পাল্লায় ও হিসাব-নিকাশে মুক্তি পাওয়া যাবে?

-আমিনুল ইসলাম
কমলগঞ্জ, আদমপুর বাজার, মৌলভীবাজার।

উত্তর : পুলসিরাত পারাপার সহজ হওয়ার জন্য আমল করার মতো কোনো দু'আ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে, মুমিন-মুত্তাক্বীরাই পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'সে দিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীর সামনে পিছনে তাদের নূর চলছে' (হাদীদ, ৫৭/১২)। আর সৎ আমলের তারতম্য অনুসারে সে দিন কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখি উড়ার গতিতে পুলসিরাত পার হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক এই দুইটি বিষয় বান্দার কাছে পাঠানো হবে। তারা পুলসিরাতের দুই পাশ ডান ও বামে এসে দাঁড়াবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৮৭৫১; মিশকাত, হা/৫৫৭৬)। তাই দ্রুত পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য মুমিন বান্দার উচিত হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে তাক্বওয়া অবলম্বন করা, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, সুন্নাতের পাবন্দি হওয়া, আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। ক্বিয়ামতের মাঠে মুক্তি পাওয়ার দু'আ। বনু কেনানা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর পিছনে ছালাত পড়েছি। অতঃপর আমি তাকে পড়তে শুনেছি, اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ الْبَأْسِ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্বিয়ামতের দিন ও কঠিন বিপদের দিন অপমানিত করবেন না' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮০৮৫; মু'জামুল কাবীর, হা/২৫২৪)। হিসাব-নিকাশ সহজের দু'আ, اللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا 'হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪২৬১; মিশকাত, হা/৫৫৬২)। মিযানের পাল্লা ভারি হওয়ার দু'আ। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, দুইটি বাক্য আছে এমন যা উচ্চারণে সহজ, মিযানের পাল্লায় ভারি হবে, দয়াময় আল্লাহর কাছে অতীব প্রিয় সেই দুইটি বাক্য হচ্ছে, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ 'আমি মহান আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৪; তিরমিযী, হা/৩৪৬৭)।

প্রশ্ন (৪৬) : আমি আমার মায়ের একমাত্র মেয়ে। মা আমার সাথেই থাকে, কিন্তু আমার শাশুড়ি আমার মাকে অপমান করে। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-জেবুন্নেছা
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : প্রতিটি মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা ঈমানের অন্যতম শিক্ষা। রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

'আর নিশ্চয়ই আপনি সুন্দর চরিত্রের অধিকারী' (আল-কলাম, ৬৮/৪)। এমনকি কারো সঙ্গে কেউ খারাপ আচরণ করলেও তার ভালো ব্যবহার করা উচিত, আত্মীয়স্বজন সুন্দর আচরণ পাবার বেশি হক্ব রাখে। কেননা কিয়ামতের দিন কর্ম বিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারি ও মূল্যবান কর্ম হবে (মানুষের) সুন্দর আচরণ (তিরমিযী, হা/১০১৬)। কাউকে অপমান অবশ্যই নিন্দনীয় একটি কাজ। এক্ষেত্রে তাকে বুঝাতে হবে এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে তার ভুল বুঝিয়ে দিতে হবে। খারাপের প্রতিদান আল্লাহ ভালো দিয়ে দিতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, 'যা উত্তম তা দিয়ে মন্দ প্রতিহত করো; তারা যা বলে আমি তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী (মুমিনূন, ২৩/৯৬)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৭) : কেউ যখন পাপ কাজে লিপ্ত থাকে (যেমন ধূমপান, কেরাম, লুডু ইত্যাদি) সে অবস্থায় কি তাকে সালাম দেওয়া যাবে?

-নাহিদ আলি
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : সালাম দেওয়ার নিষিদ্ধ কোনো সময় নেই। সুতরাং পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত সকলকে সালাম দিতে হবে। তাই পাপিষ্ট মুমিনকেও সালাম দেওয়া যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন আমলটি উত্তম? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অপরকে খাবার খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩)। এমনকি মুমিন ও কাফের এক সঙ্গে থাকলেও সালাম দেওয়ার বিধান আছে। উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গমন করলেন যেখানে মুসলিম ও মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন (বুখারী, হা/৬২৫৪; মুসলিম, হা/২১৬৫ ১০; মিশকাত, হা/৪৬৩৯)।

প্রশ্ন (৪৮) : মোবাইল বা ডিজিটাল কোনো ডিভাইসে কুরআন পড়লে কি নেকী কম হবে?

-আবূ তালেব সিদ্দিক
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

উত্তর : কুরআনের নেকী তেলাওয়াতে হয়। কোনো মাধ্যমে নয়। তবে যে মাধ্যমে তেলাওয়াত করলে মনোযোগ বেশি থাকে সে মাধ্যমেই কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত। এর জন্য সবচেয়ে ভালো মুসহাফ দেখে তেলাওয়াত করা। তাই ডিজিটাল ডিভাইস থেকে কুরআন তেলাওয়াত করলে এতে নেকীর কোনো কমবেশি হবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের যুগে তো সামান্য কয়েক কপি মুসহাফ ছিল। প্রায় সকলেই না দেখে মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন। তবে হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিভাইস থেকে পড়তে গিয়ে কল, রিংটোন, নোটিফিকেশন ইত্যাদি আসার কারণে যদি মনোযোগ ব্যাহত হয়, তবে অবশ্যই নেকী কম হবে।

প্রশ্ন (৪৯) : আমার বাসার আশেপাশে অনেক সমজিদ আছে, অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেক মসজিদে আযান হয়। এক্ষেত্রে আযানের জবাব দিব কীভাবে?

-আনছার আলী
নীলফামারী।

উত্তর : যখন একই সময়ে একাধিক জায়গা থেকে আযানের ধ্বনি শুনা যাবে, তখন শ্রবণকারীর কর্তব্য হবে প্রথম যে আযান শুনেছে সে আযানের উত্তর দেওয়া। বাকী আযানের উত্তর দেওয়া তার উপর আবশ্যক নয়। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরা তাই বলো' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১১)। এই হাদীছে মুয়াযযিন শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, একজন মুয়াযযিনের উত্তর দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে একাধিক আযানের উত্তর দেয়া জরুরী নয়। একাধিক আযানের উত্তর দেয়া শরীআতে প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (৫০) : আমি বাবা মাকে না জানিয়ে অনেক আগে টাকা নিয়ে খরচ করেছি, এখন আমি তাদেরকে বিষয়টি না জানিয়ে তাদের টাকা পরিশোধ করতে চাই। এমতাবস্থায় কি আমি ক্ষমা পাব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : কোনো পুত্রের জন্য তার পিতামাতার সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাদের অনুমতি ব্যতীত নেয়া জায়েয হবে না। এখন কেউ যদি এরকম করে থাকে, তাহলে সে মাল তাকে ফেরত দিতে হবে। তাদের জানিয়ে হোক বা না জানিয়ে হোক (ফতওয়া নূর আলাদ দারব, পিতার অগোচরে তার সম্পদ সন্তানের নেওয়ার বিধান)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه অর্থাৎ 'কোনো মুসলিমের সম্পদ তার সম্মতি ব্যতীত বৈধ নয়' (আওয়ালিউল লিআয়ি, ২/১১৩ পৃ.)।

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ

কেন হব অবরোধবাসিনী ?
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
পৃষ্ঠা : ২৪০ ■ মূল্য : ১৪০ টাকা

শিক্ষা বনাম জাহিলিয়াত
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
পৃষ্ঠা : ১৬৮ ■ মূল্য : ৯০ টাকা

আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
পৃষ্ঠা : ১৩৬ ■ মূল্য : ৯০ টাকা

রাসুল (ছা.)-এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ৩৯২ ■ মূল্য : ২২০ টাকা

মিন্নাতুল বারী
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
পৃষ্ঠা : ৩৬৮ ■ মূল্য : ৩৪০ টাকা

কে বড় লাভবান
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৬০ ■ মূল্য : ১৫০ টাকা

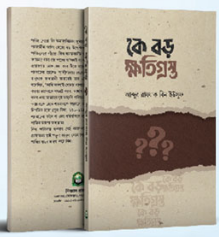

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৭৮ ■ মূল্য : ১৫০ টাকা

উপদেশ
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা :৪৫৬ ■ মূল্য :২৫০ টাকা

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে যোগাযোগ করুন

তুবা পাবলিকেশন TUBA PUBLICATION

রাজশাহী নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
বিকাশ, নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য

আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ভাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

মাকতাবাতুস সালাফ

কর্তৃক প্রকাশিত

সিলসিলা ছহীহা!

(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা)

সিলসিলা ছহীহার হাদীছসমূহ তাখরীজ ছাড়া ফিক্বহী ধারায় বিন্যস্ত

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

■ পৃষ্ঠা : ৫১২ ■ মূল্য : ৫০০ টাকা

ইলমুল হাদীস বিষয়ে আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.), তার অগাধ পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর হলো সিলসিলা ছহীহা। এতে তিনি হাদীছের মহাসমুদ্র তালাশ করে দুর্লভ মণিমুক্তাসমূহ সন্নিবেশ করে দিয়েছেন, যা মুসলিম উম্মাহর বহু অজানা হাদীছ জানার খোরাক মেটাবে।

কুরআনের ধারক-বাহকদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আজুরী, আল-বাগদাদী (রাহি)

সংক্ষিপ্তকারক: ড. খালিদ ইবনু উছমান আস সাবত (হাফি)

সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

■ পৃষ্ঠা : ৭২ ■ মূল্য : ৭০ টাকা

অমনোযোগী পুত্রের প্রতি সন্তানবৎসল এক পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ

মূল : আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (রাহি)

ভাষান্তরে: আবু আব্দুর রউফ আব্দুল কাদের বিন রঈসুদ্দীন

■ পৃষ্ঠা : ৩৬ ■ মূল্য : ৩০ টাকা

ওহে সুন্নাহর অনুসারীগণ! পরস্পরের প্রতি কোমল হোন

আল্লামা শাইখ আব্দুল মুহসিন ইবনু হামাদ আল আব্বাদ আল বাদর হাফিযাহুল্লাহ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

■ পৃষ্ঠা : ১০৪ ■ মূল্য : ১০০ টাকা

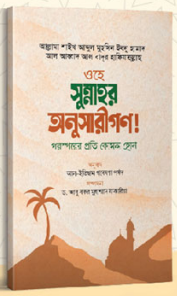

আল্লাহ যাদের সাথে পরকালে কথা বলবেন না

সাঈদুর রহমান

সম্পাদনা: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

■ পৃষ্ঠা : ৬৪ ■ মূল্য : ৬০ টাকা

মাকতাবাতুস সালাফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭